মাসুদ রানা

গুপ্তহত্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন



গুপ্তহত্যা

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৪

এক

পালারমো বন্দর। সিসিলির প্রাণকেন্দ্র।

উৎসবের ধুম পড়েছে আজ। মার্ডি গ্রাস। খ্রিস্টানদের এই গুরুগম্ভীর বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান তার বিশেষ অর্থ ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে এই বন্দরে। উৎসবের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে গোটা নগরী। খেপে উঠেছে সবাই। মহাফুর্তি। অসংখ্য রঙচঙে সুসজ্জিত স্টীমার, লঞ্চ, নৌকো দুলছে সাগরে ঢেউয়ের দোলায়। তাতে গিজগিজে ঠাসা হরেক সাজে বিচিত্র পোশাকে রঙিন নারী-পুরুষ। রাস্তায় রাস্তায় চলেছে নাচ, গান, হৈ-হল্লা। উৎসবে মত্ত আজ সবাই। বান ডেকেছে আনন্দের।

অদ্ভুত সব মুখোশ এঁটেছে নারী-পুরুষ সবাই। এই সময় কে কার হাত ধরে কোনদিকে চলেছে সব গোলমাল হয়ে যায়। একবার হাত ছুটে গেলে আর চিনবার উপায় নেই। এই দিনে চিনবার খুব একটা আগ্রহও দেখা যায় না কারও মধ্যে—সবাই চায় হারিয়ে যেতে, বিন্দুর মত মিশে যেতে জন-সিন্ধুতে। প্রায়ই এরকম—সদ্য পরিচিতা সঙ্গিনীকে রাজি করিয়ে নির্জনে নিয়ে গিয়ে মুখোশ খুলেই চমকে উঠেছে পুরুষ। নিজেরই স্ত্রী!

গ্রীষ্মকালে এই বন্দরের চেহারা অন্য রকম। তখন আসবে হাজার হাজার সস্তাদরের ট্যুরিস্ট। তেতে ওঠা বালিতে শুয়ে বাদামী করে নেবে গায়ের রঙ। সব কটা হোটেল ভরে যাবে। পিলপিল করে হেঁটে বেড়াবে সবখানে। অনর্গল ফটো তুলবে, পিকচার কার্ড ফেলবে ডাকবাক্সে, পাঁউরুটি-ডিম-চায়ের জন্যে হাঁকডাক করবে, ঝগড়া করবে, আর ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁই হাঁই করে ঘুরে বেড়াবে সর্বত্র, পাছে কিছু দেখতে বাকি থেকে যায়। চুটকি রোমান্স হবে প্রচুর, খুন-খারাবিও হবে দু'চারটে। তখনকার অবস্থা আলাদা।

কিন্তু এই সময়টাতে, নরম রোদ সবে যখন তেতে উঠেছে, ভূমধ্যসাগরের বালুকা বেলায় রোদ পোহাতে আসে আরেক জাতের ট্যুরিস্টদের দল। সাধারণ চলতি অর্থে ট্যুরিস্ট নয় এরা। কাঁধে র‍্যাকস্যাক ঝুলানো পরিব্রাজকের চিত্রটা মন থেকে মুছে ফেলুন। মস্ত বড়লোক এরা। ট্যুরিস্ট মনে করলে আঁৎকে উঠবে, এমনি সব লোক। প্রতি বছরই আসে ওরা এই সময়ে।

বন্দরে নোঙর করা ঝকঝকে চকচকে ছোটবড় হরেক আকৃতির অসংখ্য ব্যক্তিগত স্কুনার আর ইয়টের দিকে এক নজর চাইলেই বোঝা যাবে কি পরিমাণ টাকার মালিক আসে এখানে বছরের এই সময়ে। টাকার মিষ্টি গন্ধে মউ মউ করে গোটা পালারমো। কোটিপতিদের হাট বসেছে যেন। চারদিকে

টাকা আর টাকা। আর মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া।

আর সিমেন্টের গন্ধ। বিরাট বিরাট সব অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে এখানে ওখানে। প্রকাণ্ড সব হোটেল, বাংলো আর মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস তৈরি হচ্ছে আরও ট্যুরিস্টকে জায়গা দেয়ার জন্যে। টাকার গন্ধে সিমেন্ট আসে, সিমেন্টের গন্ধে টাকা। মাথা চাড়া দিয়ে আকাশে ওঠে বিশাল সব অট্টালিকা। টাকা ধরার ফাঁদ।

সবাই ইনভেস্ট করছে এখানে।

যদিও সবাই জানে, পালারমো সিসিলির প্রাণকেন্দ্র, এবং সিসিলি দুর্ধর্ষ মাফিয়ার জননী জন্মভূমি—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

কাহিনীর শুরু এখানেই।

শেষ বিকেল। চারপাশে চেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল গোলাম জিলানী।

সাগর থেকে ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া আসছে। আর খানিক বাদে ইয়টগুলোয় একটা দুটো করে বাতি জ্বলে উঠবে এখানে ওখানে। ঢেউয়ের গায়ে দুলবে প্রতিবিম্ব। রোজ সন্ধ্যায় এই দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে জিলানীর। আরও খানিকক্ষণ বসবার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু উপায় নেই, এখুনি ফিরতে হবে হোটেলে। কাবিল আসবে আজ। ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। এক মিনিট আগে বা পরে নয়।

প্যান্টের পিছনটা ঝেড়ে নিয়ে বালির উপর দিয়ে পা বাড়াল জিলানী রাস্তার দিকে। দেরি দেখলে ঘাবড়ে যাবে কাবিল, হয়তো বিপদ সঙ্কেত পাঠিয়ে বসবে হেড অফিসে, ঢাকায়।

বছর দেড়েক হলো ইস্তাম্বুল থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছে জিলানী। জায়গাটা পছন্দ হয়েছে ওর। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোন অসুবিধেই নেই। পালারমোর সেরা হোটেলে আছে সে, মস্ত ধনী ব্যবসায়ীদের ফ্লোরে। এদের সাথে ওঠাবসা করতে করতে নিজেকেও বিরাট কোন ব্যবসায়ী মনে হয় ওর এক এক সময়। মনে হয় অভিনয়টা সত্যি হলে মন্দ হত না। জীবনে এত ভাল থাকেনি সে কোনদিন।

পালারমো এক অদ্ভুত জায়গা। কে কি করছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপের সময় বা উৎসাহ কারও নেই। কারও কোন সন্দেহ বা আগ্রহ না জাগিয়ে এখানে যে কেউ যে কারও সাথে দেখা করতে পারে, আলাপ করতে পারে—কেউ চেয়েও দেখবে না। কেউ যদি গায়েব হয়ে যায়, পাওনা বিল নিয়ে ফেঁসে যাওয়া হোটেলওয়ালা ছাড়া আর কেউ এক সেকেন্ডও মাথা ঘামাবে না তা নিয়ে। খেয়ালই করবে না কেউ। কেউ না।

সীমিতসংখ্যক অলস, অযোগ্য পুলিস আছে। কাস্টম্‌স্ অফিসারদের অবস্থাও তথৈবচ। যে কোন মাল বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকানোয় বা বের করায় বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই। তাই বোধহয় এখানে এসপিওনাজের এই অস্বাভাবিক তৎপরতা। ওরা ছাড়াও আরও চারটে দেশের গুপ্তচর বিভাগ কাজ করছে এখানে মাফিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু কারও সাথে কারও যোগাযোগ নেই। সব

আলাদা।

গ্রাউন্ডওঅর্ক করছে কাবিল। গতকাল খবর দিয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য হাতে এসেছে, আজ বিকেলে দেখা করতে চায়। সাধারণ অবস্থায় হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করবার অধিকার রয়েছে শুধু জিলানীর। তাও ঘুরপথে। ভয়ানক কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হলে সরাসরি ঢাকার সাথে যোগাযোগ করবার নিয়ম নেই। কাবিলের তথ্য সে পাঠাবে রোমে, সেখান থেকে সেটা যাবে লন্ডনে, তারপর আরও কয়েক জায়গা পাক খেয়ে পৌঁছবে চট্টগ্রামে, সেখান থেকে ঢাকা। সময় যে খুব একটা বেশি লাগবে তা নয়, কিন্তু এই ঘুরপাক খেতেই হবে যে কোন তথ্য বা চিঠিকে। নিয়ম।

পাবনায় বাড়ি গোলাম জিলানীর। বিবাহিত। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে একা থাকে লুৎফা। বড়টা মেয়ে, লীনা, আট বছর; ছোটটা ছেলে, চঞ্চল, পাঁচ। প্রতি ছয়মাসে পনেরো দিনের ছুটিতে যায় সে বাড়ি। ফিরে আসবার সময়, বিশেষ করে চঞ্চলের জন্যে, বড় কষ্ট হয় ওর। বোঝে, ওর অনুপস্থিতিতে খুবই অসহায় বোধ করে বাচ্চাটা। একেবারে এতিম হয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় মাস পর বাড়ি পৌঁছে ঘন্টাখানেক লাগে ওর মান ভাঙাতে। প্রচুর জামা-কাপড় আর খেলনা দিয়ে নরম করে নিয়ে কবে ওর মা ওকে বকেছিল, কবে মেরেছিল সেসব নালিশ শুনে কথা দিতে হয় যে আর কোনদিন ওকে ফেলে কোথাও চলে যাবে না—তারপর ওর মুখে যে হাসিটা ফুটে ওঠে সেটা দেখার মত। বুকটা ভরে যায় জিলানীর। পনেরো দিনের হাসি-কান্না ঝগড়া-কৈফিয়ত আর অসংখ্য প্রশ্ন দিয়ে ওকে দখল করে নেয় বাচ্চাটা। তারপর আবার ফাঁকি দিয়ে পালাতে হয়।

মাঝে মাঝে মনে হয় জিলানীর, চঞ্চলকে এখানে নিয়ে আসতে পারলে বড় ভাল হত, রিকেটি ভাবটা দূর হয়ে যেত এই আবহাওয়ায়। ভাল খাওয়া-দাওয়া পেয়ে ফিরে যেত স্বাস্থ্যটা। কিন্তু এই ইচ্ছে যে পূরণ হবার নয়, ভাল করেই জানে সে। এজেন্টদের একথা চিন্তা করাও পাপ। ফ্যামিলিকে সব সময় নাগালের বাইরে রাখতে হবে। নইলে যে কোন মুহূর্তে প্রিয়জনকে কিডন্যাপ করে এজেন্টকে কাবু করে ফেলতে পারে শত্রুপক্ষ। কাজেই ওদের আনা সম্ভব নয়।

এসব ব্যাপারে ঢাকা অফিস খুবই সতর্ক। সরাসরি বাড়িতে চিঠি পর্যন্ত লেখার হুকুম নেই জিলানীর। রোমে পাঠাতে হবে প্রথম, সেখান থেকে নতুন খামে ভরে আরেক ঠিকানায় পাঠানো হবে ওটাকে, সেখান থেকে আরেক ঠিকানায়। এইভাবে কোন কোন চিঠি পৌঁছতে একমাস দেড়মাসও লেগে যায়। এই সাবধানতার প্রয়োজন আছে। হেড অফিস জানে, কোন কোন এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তাদের চিঠিপত্র খুলে পড়বে শত্রুপক্ষ, গোপন থাকবে না কিছুই। তাই প্রত্যেক ঠিকানায় চিঠি পৌঁছলেই ভাল মত পরীক্ষা করে দেখা হয় তৃতীয় কোন ব্যক্তি ওটা খোলার চেষ্টা করেছিল কিনা।

এটাকে অযথা অতি সাবধানতা মনে করে জিলানী। ভাবে এত সতর্কতার

সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে? এসব বাড়াবাড়ি। তাই, মাঝে মাঝে যখন প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে ওঠে, হাঁপ ধরে যায়, বার বার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বাচ্চাটার মুখ, লুৎফার জন্যে বুকের ভিতরটা কেমন করে, মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়ার জন্যে হাত দুটো নিশপিশ করে, তখন চিঠি লিখে চোখ কান বুজে টুপ করে ফেলে দেয় সে ডাক বাক্সে।

সরাসরি বাড়ির ঠিকানায়।

ওর ধারণা কাক-পক্ষীও টের পায় না ব্যাপারটা।

'আপনি সিনর গোলাম জিলানী?' ঘরের চাবি চাইতেই জিজ্ঞেস করল নতুন ডেস্ক ক্লার্ক। জিলানীকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'আপনার জন্যে একটা চিঠি আছে।'

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে খামটা খুলল জিলানী। কিসের চিঠি! কারও তো চিঠি লিখবার কথা নয় ওকে! একনজর দেখেই বুঝতে পারল সে চিঠিটা কার লেখা। বিস্ময় বাড়ল তাতে আরও।

ইংরেজীতে টাইপ করা কয়েকটা মাত্র শব্দ: হোটেল স্যাভয়। পৌনে ছ'টায় দেখা করুন।

ঘাবড়ে গেল জিলানী। হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কি? বরাবর এই হোটেলের লবিতে দেখা হয়েছে ওদের। দু'জন হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে সমুদ্রের ধারে। যা বলবার মুখেই জানিয়েছে কাবিল। সাগর পারে কারও শুনে ফেলবার ভয় থাকে না। পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন লোক এসে পড়লেই কথা বন্ধ করে ওরা। এই সহজ নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন হলো কেন?

লেখাটা যে কাবিলের পোর্টেবল স্মিথ করোনাতে টাইপ করা তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ও' অক্ষরটার মাথা ভাঙা, অনেকটা 'ইউ' এর মত দেখায়। কিন্তু হোটেল স্যাভয়টা আবার কোথায়? পালারমোতে এই নামে কোন হোটেল আছে বলে তো ওর জানা নেই।

বুড়ো বেয়ারাটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সমাধান হয়ে গেল সমস্যা।

'তৈরি হচ্ছে, সিনর,' বলল সে। 'মাস তিনেকের মধ্যেই ওপেন করা হবে। আমাদের কোম্পানিরই হোটেল। রিউ মনটেনে। সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড বিল্ডিং উঠছে। ওই, ওদিকে—দেখেননি?'

পাহাড়ী পথ ধরে এগোল জিলানী। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে অস্বস্তিতে। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মারাত্মক কোন গোলমাল। আগেও এরকম দু'চারটে নোট পেয়েছে সে, এই রকমই সংক্ষিপ্ত। শুধু একটি সময় আর একটা জায়গার নাম। চিঠির শুরুতে কোন সম্বোধন নেই, শেষে কোন স্বাক্ষর নেই। এই রকমই। কিন্তু সেসব অন্য ব্যাপারে। তথ্য দেবার ব্যাপারে আগের ব্যবস্থাই বলবৎ থেকেছে সব সময়।

বাম হাতে শোল্ডার হোলস্টারের গায়ে মৃদু চাপ দিয়ে বেশ কিছুটা ভরসা পেল জিলানী। তাছাড়া খামটা যে আর কেউ খোলেনি, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত সে। খাম বন্ধ করবার সময় মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে এমন ভাবে ভরে দেয়

কাবিল যে কেউ চিঠি খুললে ওটাকে আর যথাস্থানে পাওয়া যাবে না। ঠিক জায়গা মতই পেয়েছে চুলটা জিলানী।

তবু। তবু কেন যেন খটকা যাচ্ছে না মন থেকে। হাঁটতে হাঁটতে বার কয়েক ঝট করে পিছন ফিরে চাইল সে। বেশ কিছুদূর চলবার পর নিশ্চিন্ত হলো—কেউ অনুসরণ করছে না ওকে।

কিন্তু এর ফলে স্বস্তি বোধ করল না।

সামনেই দেখা যাচ্ছে হোটেল স্যাভয়ের বিশাল কাঠামো। রাস্তার দুই ধারে ঝোপের মধ্যে বসে পাল্লা দিয়ে ডাকছে ঝিঁঝি পোকার দল। বাতাসে নাম না জানা ফুলের ভারি মিষ্টি সুবাস। দূর থেকে ভেসে আসা হল্লা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে চাইল জিলানী। রঙচঙে ইয়টগুলোয় নারী-পুরুষের হুল্লোড়। কোনটা ঠায় দাঁড়িয়ে, কোনটা দু'পাশে ঢেউ তুলে পানি কেটে ছুটছে তীরবেগে। ছোট ছোট লঞ্চগুলো ফেরির কাজ করছে, মন্থরগতিতে চলছে গুটিগুটি। পড়ন্ত রোদে স্বপ্নের মত লাগছে সবকিছু।

চোখ ফিরিয়ে দ্রুতপায়ে এগোল জিলানী।

বারোআনা কাজ হয়ে গেছে, দরজা জানালা বসে গেছে জায়গা মত, এখন শুধু একতলার মেঝে ঢালাই করে দেয়ালগুলো প্লাস্টার করলেই শেষ হয়ে যাবে সিমেন্টের কাজ। তারপর ফিটিংস। তারপর একমাস ধরে চলবে পেইন্ট, পলিশ। তারপর আসবে ফার্নিচার। অনেক ঝামেলা।

আশপাশে একটাও মিস্ত্রির বা দারোয়ানের দেখা পেল না জিলানী। সবাই উৎসবে মত্ত। তিনগুণ ওভারটাইম দিলেও আজকের দিনে কাজ করবে না কেউ এখানে।

খোলা গেট দিয়ে সাবধানে ভিতরে ঢুকল জিলানী। নিজের অজান্তেই পিস্তলটা চলে এসেছে ওর হাতে।

ভিতরে কোন লোক আছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রকাণ্ড একটা কংক্রিট-মিক্সার দেখতে পেল সে দোতলায়। একপাশে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা দৈত্যাকার ক্রেন। নিচতলায় এবড়োখেবড়ো মাটি, একদিকে গাদা করা আছে কয়েকশো সিমেন্টের বস্তা, জায়গায় জায়গায় ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে বালি, এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে রিইনফোর্সিং রড, স্টীলের বীম—কন্ট্রাক্টরের সরঞ্জাম।

'কাবিল!' ডাকল জিলানী। ভয় পেল নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনে। কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ। গা ছমছম করে।

তিন সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কি বলল বোঝা গেল না, কিন্তু আওয়াজটা লক্ষ্য করে এগোল সে সামনে। হোটেলের ঠিক মাঝখানে বড়সড়, লম্বা একটা নিচু গর্তের পাশে এসে দাঁড়াল জিলানী। এখানে সুইমিং-পুল তৈরি করা হবে। সমুদ্রতীরের হোটেলে উঠে সুইমিং-পুলে চান করা বোধহয় আভিজাত্যের লক্ষণ—সাগরে নামাটা নেহাত সাদামাঠা হয়ে যায়। তাই তৈরি হবে এখানে ফ্যাশনেবল সুইমিং-পুল।

এদিকে ওদিকে চাইল জিলানী। আবার ডাকল, 'কাবিল! কি হলো?

কোথায় তুমি?'

একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ঝট করে উপর দিকে চাইল জিলানী। ছাতটা খোলা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোয়। আবছা দেখা যাচ্ছে মাথার উপর কংক্রিট মিক্সারটা। এক এক বারে পঞ্চাশ টন কংক্রিট তৈরি করে ঢেলে দিতে পারে প্রকাণ্ড যন্ত্রটা। শব্দটা ওখান থেকেই এল না? নড়ছে কেন ওটা?

কেন নড়ছে যখন বুঝতে পারল, তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। কাত হয়ে গেছে প্রকাণ্ড ড্রামটা। হড়হড় করে নেমে আসছে রাশি রাশি তরল কংক্রিট।

দৌড় দেয়ার চেষ্টা করল গোলাম জিলানী। কিন্তু ততক্ষণে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মত প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর উপর কয়েকশো মন নরম কংক্রিট। সুইমিং-পুলের জন্যে তৈরি করা গর্তে পড়ে গেল সে হুড়মুড় করে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, আবার পড়ল হড়হড় করে—নেমে আসছে তরল মৃত্যু। ডুবে যাচ্ছে সে কংক্রিটের নিচে। জ্যান্ত কবর দেয়া হচ্ছে ওকে!

সিমেন্টের প্রপাত যখন থামল তখন সে তলিয়ে গেছে তিন ফুট নিচে। প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল জিলানী। কংক্রিটের প্রচণ্ড চাপ ঠেলে দুই ইঞ্চির বেশি উঁচু করতে পারল না শরীরটা। চারপাশ থেকে আরও চেপে ধরছে কংক্রিট। দম নেয়া যাচ্ছে না। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর।

চরম সত্যের সম্মুখীন হয়ে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল জিলানী। প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করল সে। হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করল, সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল—কিন্তু নড়তে পারল না এক ইঞ্চিও।

হাল ছেড়ে দিতেই বাচ্চাটার হাসিমুখ ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

খোদা! রইল ওরা, তুমি দেখো!

দুই

সোজা মেজর জেনারেল রাহাত খানের চোখের দিকে চাইল মাসুদ রানা। বিস্মিত দৃষ্টি। হাতে গোটা কয়েক সবুজ রঙের পোস্টকার্ড সাইজের কার্ড।

'সব ক'জন?' জিজ্ঞেস করল সে। কার্ডের উপর ছোট্ট লাল কাটা চিহ্ন দেখেই বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা।

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল।

'হ্যাঁ। সব। এদের বেশির ভাগই তোমার চেনা, তাই না, রানা?'

এগারো জনের মধ্যে আটজনকেই চেনে সে। আবার একে একে এগারোটা কার্ডের উপর চোখ বুলাল রানা। স্পষ্ট ভেসে উঠল মনের পর্দায় পরিচিতদের চেহারা। সাতজন ছেলে, একজন মেয়ে। এরা ছাড়াও অপরিচিত তিনজন। এদের কেউ আজ বেঁচে নেই। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কার্ডগুলো রয়ে

যাবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ফাইলে আরও বহু বছর। তারপর রেকর্ডের বাক্সে ভিড় কমাবার জন্যে একটা লিস্টে নাম টুকে নিয়ে ফেলে দেয়া হবে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। ভুলে যাবে সবাই দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিল এগারোজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট। কিন্তু কেন? কেন মারা গেল এরা? কারা মারল?

'মাফিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছিল এরা সবাই,' সহজ কণ্ঠে কথাটা বলবার চেষ্টা করলেন মেজর জেনারেল, কিন্তু রানা লক্ষ করল মুহূর্তের জন্যে দপ করে জ্বলে উঠল বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ দুই চোখ। 'গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দিয়েছে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে।'

একটা বোতাম টিপ দিতেই মেজর জেনারেলের পিছনে সারাটা দেয়াল জুড়ে ভেসে উঠল বুট জুতোর আকৃতির একটা মানচিত্র। মুহূর্তে চিনতে পারল রানা। ইটালির ম্যাপ। এগারোটা লাল চিহ্ন দেখতে পেল সে ম্যাপের গায়ে।

'চিহ্ন দেয়া জায়গাগুলোয় মারা গেছে ওরা।' বলে দেয়ার দরকার ছিল না, তবু ঘোষণা করলেন বৃদ্ধ। 'প্রায় একই পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে সব ক'জনকে। খুব সম্ভব একই লোকের কাজ।'

রানা দেখল, জেনোয়া, স্পেযিয়া, লেগহর্ন, নেপল্‌স, পালারমো, মেসিনা, টারান্টো, ব্রিনডিসি, বারি, অ্যাংকোনা এবং ভেনিসের গায়ে লাল চিহ্ন দেয়া। অদ্ভুত একটা মিল লক্ষ্য করল সে।

'সব কটা বন্দর,' বলল ও। 'প্রত্যেকটা খুন হয়েছে কোন না কোন সমুদ্র বন্দরে।'

'সাধারণত বন্দর এলাকাতেই কাজ করে মাফিয়া। ওদের একটা মহা-পরিকল্পনার আভাস পেয়ে আমি লোক লাগিয়েছিলাম ওইসব জায়গায়। কিন্তু আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা গেছে।'

পেপারওয়েট দিয়ে চাপা গোটা দুয়েক ফটোগ্রাফের দিকে ইংগিত করলেন মেজর জেনারেল ভুরু নাচিয়ে, তারপর সিগারেট ধরাবার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

ফটো দুটো তুলে নিল রানা।

একটা তিন মাস্তুলের ইয়টের ছবি। সুপ্রামার ডিজাইনের হাইড্রোফয়েল। ছবির দিকে এক নজর চাইলেই বোঝা যায় কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এই ইয়টের পিছনে। ইয়টের গায়ে লেখা নামটা দেখেই ভুরু কুঁচকে গেল ওর। চট করে দ্বিতীয় ছবিটার দিকে চাইল সে।

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া একজন লোক হাসছে ক্যামেরার দিকে চেয়ে, কাঁধে ঝুলানো একটা স্কোপ ফিট করা রাইফেল, এক মাথা উস্কখুস্ক চুল। ডান পা-টা নিহত বাঘের গায়ের উপর তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোজ নিয়ে।

চমকে উঠল রানা। ব্যাপার কি! বিখ্যাত মার্কিন শিকারী কোটিপতি হার্স্টের ছবি!

'হেনরী হার্স্ট না, স্যার?' রানার কণ্ঠে বিস্ময়। 'আর এটা ওর সেই নামজাদা ইয়ট—সোফিয়া! এই হত্যার সাথে ওর কি সম্পর্ক!'

'তা জানি না,' একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার কণ্ঠে বললেন মেজর

জেনারেল, 'শুধু জানা গেছে, যখন যেখানে আমাদের এজেন্টরা খুন হয়েছে ঠিক সেই সময় সেই সব বন্দরে নোঙর করা ছিল সোফিয়া। এখন ওটা রয়েছে পালারমো বন্দরে। নিখোঁজ হয়েছে গোলাম জিলানী।'

'তার মানে নিজের অজান্তেই হত্যাকারীকে ইয়টে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হেনরী হার্স্ট? হয় অতিথি, নয় কর্মচারী হিসেবে?'

বাম হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের পাশটা চুলকালেন মেজর জেনারেল, মাথা ঝাঁকালেন, তারপর সোজা রানার চোখের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'অথবা সে নিজেই হত্যাকারী!'

হেনরী হার্স্টের মত একজন কোটিপতি লোক মাফিয়ার গুপ্তঘাতক হিসেবে কাজ করতে পারে, এমন উদ্ভট কথা শুনে হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না রানা। এই লোকের বরং মাফিয়ার বিরুদ্ধেই কাজ করবার কথা। নির্ভীক এক আমোদপ্রিয় শিকার-পাগল কোটিপতি হিসেবে যার দুনিয়াজোড়া নাম, সে কি কারণে মাফিয়ার সাথে হাত মেলাতে পারে আন্দাজ করাও ওর পক্ষে মুশকিল। তবে মেজর জেনারেল যে কেন শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করে ওকে এই কিছুক্ষণ আগে কোন সামুদ্রিক ইয়টে কিছুদিন বেড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, আন্দাজ করতে পারছে সে এখন।

'ওকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে ভাবছেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা বুড়োর মন বুঝবার জন্যে।

'সম্ভব,' সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন মেজর জেনারেল। 'কিন্তু আরও একটা সম্ভাবনার কথাও ভাবছি আমি।'

'আসলে হয়তো লোকটা হেনরী হার্স্টই নয়, অন্য আর কেউ—এই ধরনের কিছু, স্যার?'

কটমট করে রানার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন মেজর জেনারেল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বললেন, 'তোমার মাথা! আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, এই লোক আসল হার্স্ট। আমি ভাবছি, মাফিয়ার সাথে কোন একটা চুক্তিতে এসে থাকতে পারে লোকটা।'

হতবাক হয়ে বসে রইল রানা। কোন কথা বলল না।

রানাকে কথা বলতে না দেখে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন বৃদ্ধ।

'বছর খানেক আগে ছয়জনের এক শিকার-পার্টি নিয়ে কোস্টারিকায় গিয়েছিল হার্স্ট পাহাড়ী ছাগল শিকার করতে। জানা যায়, সেখানে বন্দী হয়েছিল ওরা মাফিয়ার একটা দলের হাতে। তেইশ দিন পর একা হার্স্ট ফিরে এসেছিল ইয়টে। সেই সময় কোনরকমের চুক্তি হয়ে থাকতে পারে ওদের মধ্যে।' আবার একবার বিরক্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন বৃদ্ধ রানার ভাবলেশহীন মুখের উপর। রানা বুঝল এই অবিশ্বাস্য কথাগুলো তিনি নিজেও পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না, তবু ব্রিফিঙ-এর সময় সব রকমের সম্ভাবনার কথা এজেন্টকে জানানোর নিয়ম বলে বলতে হচ্ছে ওঁকে। এবং তাই রেগে যাচ্ছেন অকারণে ওরই উপর। বললেন, 'কে কখন কেন কি করে বোঝা বড় শক্ত, রানা। হার্স্ট

একজন পাকা শিকারী। শিকার ওর নেশা। পৃথিবীর এমন কোন হিংস্র জন্তু বা মাছ নেই যা ও শিকার করেনি। হত্যার ব্যাপারে ওর সমান অভিজ্ঞতা খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু হাজার হোক, জন্তু জানোয়ার শিকার করার মধ্যে একটা একঘেয়েমি আছে। হাজার হোক, অবলা জীব ওরা, বুদ্ধি বলতে কিচ্ছু নেই। ধরো, ওকে যদি প্রস্তাব দেয়া যায়, মাফিয়া কোনদিন ওর কোন ক্ষতি করবে না, কিন্তু বিনিময়ে ওদের হয়ে ওকে নামতে হবে শিকারীর ভূমিকায়: এমন এক শিকার, যেখানে শুধু দক্ষতা থাকলে চলবে না, প্রয়োজন চরম ধূর্ততা এবং সতর্কতা; এমন এক শিকার, যে শুধু গুলি খায় না, গুলি করেও। এই রকম একটা প্রস্তাবে কি রাজি হয়ে যেতে পারে না ওর মত একজন খেলুড়ে স্বভাবের শিকারী কোটিপতি?'

ব্যাপারটার মধ্যে প্রচুর 'যদি' আর 'হয়তো' থাকা সত্ত্বেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না রানা, গুপ্তঘাতকের ভূমিকায় চমৎকার মানিয়ে যায় হেনরী হার্স্ট। ঠিক যে সব গুণ একজন ঘাতকের মধ্যে থাকা দরকার, সবগুলোই রয়েছে ওর মধ্যে অথচ সন্দেহ করবে না কেউ।

'অসম্ভব নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু আমাদের তরফ থেকে এর সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে, স্যার?'

'বিফল-চেষ্টা হয়েছে।' জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আনমনে কয়েক সেকেন্ড সিগারেট টানলেন মেজর জেনারেল। ওদিকে চেয়ে থেকেই বললেন, 'দুবার। সাদেক আর বিশ্বাস চাকরি নিয়েছিল হার্স্টের ইয়টে। দুজনই নিখোঁজ।'

'ওদের কাছ থেকে কোনরকম রিপোর্টই পৌঁছেনি?'

'না। সিম্পলি হাওয়া হয়ে গেছে ওরা।'

বিশ্বাসের সাথে পরিচয় ছিল না রানার, কিন্তু নাম জানা ছিল। আর সাদেক বছর দুয়েকের জুনিয়ার হলেও বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল একটা অ্যাসাইনমেন্টে একসাথে কাজ করতে গিয়ে—ভাল করেই চেনে ওকে রানা। দুজনেই তুখোড় এজেন্ট ছিল। নিশ্চয়ই কোন না কোন ভাবে ওদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল গুপ্তঘাতকের কাছে।

'এই ইয়টেই বেড়াতে যাওয়ার কথা বলছিলেন একটু আগে?' মুচকি হাসল রানা। 'বিশ্রাম ছাড়া আর কি করতে হবে আমাকে, স্যার?'

'হত্যা করতে হবে ঘাতককে।'

তিন

'দারুণ! তাই না?'

স্পীডবোটে উঠে ছবির মত সুন্দর ইয়টটার দিকে হাত তুলে ইংগিত করল জ্যাক ডেল। বন্দর থেকে মাইল খানেক দূরে নোঙর ফেলে রাজহাঁসের

মত সহজ, অনায়াস ভঙ্গিতে ভেসে আছে সোফিয়া। নিচটা গাঢ় সবুজ, উপরটা উজ্জ্বল ঘিয়ে রঙে পেইন্ট করা। এত দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ঝকঝকে ব্রাস-রেইল চকচক করছে রোদ লেগে। মাস্তুল আর বোস্প্রিট সৃষ্টি করেছে আলাদা এক সৌন্দর্য। কেমন যেন রহস্যময়, অলৌকিক, অবাস্তব মনে হচ্ছে ছিমছাম ইয়টটাকে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে নীল সমুদ্র ছেড়ে ইচ্ছে করলেই হাওয়ায় ভেসে উড়ে যেতে পারে ওটা।

'সত্যিই! চমৎকার!' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে সোনা দিয়ে মোড়া। ভুলই করলে বোধহয় তুমি, জ্যাক। আমাকে মানাবে না ওটাতে।' মুভি ক্যামেরা তুলে সোফিয়ার দিকে তাক করে কয়েক ফুট ফিল্ম এক্সপোজ করল রানা, তারপর নামিয়ে রাখল আবার।

'এখনও তোমার সংকোচ যাচ্ছে না, রানা!' অমায়িক হাসি হাসল জ্যাক ডেল। গোঁফে তা দিল। 'আসলে যা ভাবছ তা মোটেই নয়। হেনরী কোটিপতি হতে পারে, কিন্তু লোক খারাপ না। তোমার পছন্দ হবে ওকে। তা নইলে আমার সাথে খাতির থাকতে পারে ওর? বলো? আমি ওর সমপর্যায়ের লোক হলাম?'

হাসল রানা।

'কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েও তুমি যদি নিজেকে ওর সমপর্যায়ের বলে মনে করতে না পারো, তাহলে আমি কি? খেটে খাওয়া ফ্রীল্যান্স ক্যামেরাম্যান। তোমরা ছোটকালের বন্ধু, একই স্কুল কলেজে পড়েছ, তোমার কথা আলাদা, কিন্তু আমি কি বলে...'

'বাদ দাও তো বাজে চিন্তা!' ধমক দিল জ্যাক ডেল। 'যদি খাতির যত্নের অভাব দেখো তখন বলো। সেই মুহূর্তে ওর ইয়ট ছেড়ে চলে যাব।' সিগারেট এগিয়ে দিল রানার দিকে। 'সংকোচের কোন মানেই হয় না। সত্যি!'

জ্যাক ডেলের ধারণা, কায়রোর হোটেল সেমিরেমিসের লাউঞ্জে হঠাৎ দুই বছর পর কপালগুণে দেখা হয়ে গেছে ওর সেই সিংহ-হৃদয় ইজিপশিয়ান বন্ধু মাসুদ রানার সাথে। এই হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা যে পূর্ব-পরিকল্পিত এবং এর জন্যে কতখানি তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসতে হয়েছে রানাকে ঢাকা থেকে, টের পেলে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যেত ওর। কিন্তু রানাকে কোন চেষ্টাই করতে হলো না। আভাস-ইঙ্গিত—কিচ্ছু না। ওর হাতে তেমন কোন জরুরী কাজ নেই জেনে জ্যাকই আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল সরাসরি, কোন ওজর-আপত্তি শুনবে না, ওর সাথে কদিন বেড়িয়ে আসতে হবে হেনরী হার্স্টের ইয়ট সোফিয়া থেকে। চাপাচাপির মুখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানাকে নিমরাজি হতে দেখে মহা খুশি হলো সে, যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে হাতে। তক্ষুণি কেবল্ করে জানিয়ে দিল হার্স্টকে, একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে আসছে। রানাকে পইপই করে বলে দিল যেন এয়ারপোর্টে হাজির থাকে পরদিন সকাল সাতটায়।

গোটা দুই সিক্সটিন মিলিমিটার প্যালিয়ার্ড বোলেক্স সিনে ক্যামেরা, সেইসাথে নানান জাতের একগাদা লেন্স আর কয়েক হাজার ফুট র'ফিল্ম নিয়ে ঠিক সময় মত হাজির হয়ে গেল রানা এয়ারপোর্টে।

রানার পরিচয়, সে ফ্রীল্যান্স ফিল্ম ক্যামেরাম্যান। ঘুরে বেড়ায় দুনিয়াময়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফিচার-ফিল্ম তৈরি করে বিক্রি করে বড় বড় টেলিভিশন কোম্পানির কাছে। আগেও বহুবার এই ছদ্ম-পরিচয়ে কাজ করেছে রানা। এর মস্ত বড় সুবিধে: যে কোন জায়গায় যেতে পারে, যে কোন প্রশ্ন করতে পারে যে কোন লোককে, এমন সব আচরণ করতে পারে সে অনায়াসে, যা অন্য কেউ করলে অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারত লোকের কাছে।

সোফিয়ার পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে স্পীডবোট। পিঠের উপর বড় বড় সাদা হরফে সোফিয়া লেখা নেভি-ব্লু জার্সি পরা ড্রাইভার মূর্তির মত বসে আছে হুইল ধরে। স্পীড কমাল একটু।

সদ্য কেনা স্ট্র হ্যাটটা একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে চাইল রানা ইয়টটার দিকে।

ঠিক সেই সময় কড়াৎ করে গুলির আওয়াজ হলো। কে যেন গুলি করল ইয়ট থেকে। রাইফেলের গুলি।

লাফিয়ে উঠল রানার মাথার টুপিটা। ছিটকে গিয়ে পানিতে পড়ল সেটা। চট করে তুলে নিয়ে দেখল রানা, গোল দুটো গর্ত দেখা যাচ্ছে হ্যাটের গায়ে। এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা

অভ্যর্থনাটা পছন্দ হলো না ওর। 'এটা কি ধরনের ভদ্রতা হলো, হেনরী?' চিৎকার করে উঠল জ্যাক ভেল কাছাকাছি পৌছেই। 'এটা কি রকমের অভ্যর্থনা? বন্ধুকে স্বাগত জানাবার এই নতুন নিয়ম শিখলে কোথায়?'

হ্যাটটা পানি থেকে তুলে ঝেড়ে নিয়ে আবার মাথায় পরেছে রানা, যেন কিছুই হয়নি। সিড়ি বেয়ে ভেলের পিছু পিছু ইয়টের ঝকঝকে ডেকে উঠে এল ও।

'বন্ধু!' তাজ্জব হয়ে যাওয়ার ভান করল হেনরী হার্স্ট। বাম বাহুর উপর আলগোছে রাখা একটা চকচকে টু-ফিফটি স্যাভেজের গায়ে আদর করছে সে ডান হাতে। 'এই ভদ্রলোক আমার বন্ধু হলো কবে? পরিচয় হওয়া তো দূরের কথা, কোনদিন দেখেছি বলেও তো মনে হচ্ছে না?'

লম্বা চওড়া লোক হেনরী হার্স্ট। গায়ের রঙ রোদে পোড়া বাদামী। চেহারায় শিকারীর কষ্ট সহিষ্ণুতা আর সতর্কতার ছাপ। ডানগালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। বোধহয় বেকায়দায় থাবা খেয়েছিল কোন. বন্য জন্তুর। ঢিলেঢালা একটা পোশাক পরে রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারাটা কঠোর দেখালেও কথায় উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত, রুচিশীল পূর্ব আমেরিকানী ছাপ। একনজরেই বোঝা যায়, কষ্ট করে উপার্জন করতে হয়নি একে কোনদিনই, উত্তরাধিকার সূত্রে কোটিপতি হয়েছে লোকটা অনায়াসে। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে এখন রানার দিকে। চোখ দুটোয় একঘেয়েমির বিরক্তি।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে বাড়িয়ে ধরল রানা লোকটার দিকে।

'ভেরি গুড শূটিং। অবশ্য, যদি ধরে নেয়া যায় যে শুধু টুপিটাই ছিল আপনার লক্ষ্য।'

অপূর্ব সুন্দর হাসি ফুটে উঠল হেনরী হার্স্টের মুখে। কঠোর চেহারাটা আশ্চর্য রকম বদলে গেল হাসিটা ফুটে উঠতেই। হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্যে।

'তাই ছিল। মিস্ করার জন্যে গুলি ছুঁড়ি না আমি। যাই হোক, আপনি যে-ই হন না কেন, স্বাগতম।'

চট করে রানার পরিচয় দিয়ে ফেলল জ্যাক ডেল।

'ইনি হচ্ছেন মাসুদ রানা। আমার বিশেষ বন্ধু; ইজিপশিয়ান ক্যামেরাম্যান। তোমার মতই ভ্রমণপ্রিয় লোক।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমিও দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই এবং প্রচুর শূট করি। তবে আমার শূটিং আপনার মত অত মারাত্মক নয়।'

মনের মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলেছে রানার। এই গুলিটার কি মানে? কোটিপতির খেয়াল? নাকি হুঁশিয়ারী সঙ্কেত? বুঝিয়ে দেয়া হলো ওকে যে ওর পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জানতে বাকি নেই হার্স্টের?'

'রানার এসব ভিজে-বেড়ালী কথায় ভুলো না, হেনরী!' কোটিপতিকে সাবধান করল জ্যাক চোখ পাকিয়ে। 'কিভাবে রাইফেল চালাতে হয় জানা আছে ওর। ওর মত নিশানা আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি।' রানার দিকে ফিরল সে। 'বেদুঈনদের হাত থেকে কিভাবে আমাদের বাঁচিয়েছিলে মনে নেই?'

'আচ্ছা! এরই গল্প বলেছিলে তুমি আমাকে?' কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোটিপতির চোখ। 'দেখা যাক। নিন, ধরুন।'

হঠাৎ রানার দিকে রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল হেনরী হার্স্ট। খপ করে একহাতে ওটা শূন্যে ধরে ফেলল রানা। মনে মনে ঝেড়ে ফুলস্পীডে গাল দিচ্ছে সে তখন জ্যাক ডেলকে। এভাবে ওকে ঠেলে সামনে বাড়িয়ে দেয়াটা ঠিক হলো না। কিন্তু কথা যখন উঠেই পড়েছে, তখন আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না।

আট-দশ জোড়া নানান দেশী কোটিপতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে ছিল ডেকের উপর, উৎসুক দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওরা রানাকে। রানাকে রাইফেল হাতে এদিক ওদিক টার্গেট খুঁজতে দেখে দামী সোফা ছেড়ে উঠে এল কয়েকজন।

'ছোটখাট একটা বাজি হয়ে যাক, হেনরী?' উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বলল জ্যাক ডেল। ঠোঁটে চকচকে চতুর হাসি।

'অলরাইট, জ্যাক,' বাঁকা চোখে চাইল হার্স্ট জ্যাক ডেলের দিকে। 'বিশ হাজার?'

'তাই সই।'

জ্যাক ডেলের চেহারাটা খুশি খুশি হয়ে উঠতে দেখে রানা বুঝতে পারল ওকে এই ইয়টে নিয়ে আসবার জন্যে এত বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল কেন লোকটা। কায়দা করে হাজার বিশেক ডলার কামিয়ে নেয়ার তাল করেছে ব্যাটা।

জুতসই টার্গেট না পেয়ে টুপিটার দিকে চাইল রানা। এটা আর ব্যবহারযোগ্য নেই। বামহাতে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ওটা শূন্যে। সাগরের উপর দিয়ে বাতাসে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে ওটা ঘুরতে ঘুরতে। খুব ধীরে ধীরে নামছে।

গজ পঞ্চাশেক দূরে টুপিটা যখন পানি ছুঁই ছুঁই করছে তখন সহজ ভঙ্গিতে কাঁধে তুলে নিল রানা রাইফেলটা। গুলি করল। লাফিয়ে উঠল টুপিটা। ডিগবাজি খেতে খেতে চলছে ওটা এখন। আশপাশ থেকে প্রশংসার গুঞ্জন শোনা গেল। দ্বিতীয় গুলি খেয়ে আবার লাফিয়ে উঠল টুপিটা। আরও দূরে সরে গেছে ওটা। আবার গুলি করল রানা। আবার লাফিয়ে উঠল টুপি। হৈহৈ করে উঠল ইয়টের কোটিপতি অতিথিরা। চতুর্থবার ট্রিগার টিপতেই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো—গুলি শেষ। ঢেউয়ের মাথায় নেমে পড়ল টুপিটা, ডুবে যাচ্ছে।

'নাইস শূটিং! ভেরি নাইস শূটিং!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে উঠল অপূর্ব সুন্দরী এক বিকিনি-যুবতী।

'জলদি শ্যাম্পেন খাওয়াও ভদ্রলোককে,' চেঁচিয়ে উঠল এক কর্কশকণ্ঠ কোটিপতি।

সাদা জ্যাকেট পরা এক স্টুয়ার্ড দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল ট্রে হাতে। শ্যাম্পেন ককটেল। বামহাতে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে রাইফেলটা এগিয়ে দিল রানা হার্স্টের দিকে।

'খুব সুন্দর যন্ত্র। পারফেক্ট।'

'ভাল দেখিয়েছেন,' বলল হার্স্ট। কিন্তু রানা লক্ষ করল, হাসির মধ্যে আর ততটা আন্তরিকতা নেই। তারই রাইফেল দিয়ে তারই চোখের সামনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ায় আত্মগরিমায় চোট লেগেছে কোটিপতির। সামান্য ফুলে উঠেছে নাকটা। ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে সে। স্টুয়ার্ডকে বলল, 'আমার পানামা হ্যাটটা নিয়ে এসো তো এক দৌড়ে।' রাইফেলটা রিলোড করতে শুরু করল সে কোনদিকে না চেয়ে।

হ্যাট এল। প্রস্তুতি নিচ্ছে হার্স্ট। রানা লক্ষ করল, অতিথিদের মধ্যে একটু উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। যেকোন প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা আছে, দর্শকেরা যেকোন একটা পক্ষ নিয়ে খেলায় শরিক হয়ে যায়, কিন্তু এদের মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না এরা কোন পক্ষ সমর্থন করছে। কোটিপতিদের মন বোঝা ভার। বড় সর্পিল গতিতে চলে এদের ভাবনা চিন্তা। এরা কি চায় হার্স্ট জিতুক, নাকি চায় হেরে গিয়ে ছোট হয়ে যাক সবার চোখে?

হ্যাটটা ভেসে পড়ল বাতাসে। প্রায় ষাট গজ যাওয়ার পর প্রথম গুলি করল হেনরী হার্স্ট। পরপর ছয়টা গুলি করল সে, প্রতিবারই লাফিয়ে উঠল হ্যাটটা শূন্যে, তারপর ঝুপ করে পড়ল পানিতে। প্রশংসাগুঞ্জন উঠল না কিন্তু এবার। যেন সবাই জানত যে হার্স্টের গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে না। হাসিমুখে জ্যাক ডেলের দিকে ফিরল হার্স্ট।

'বিশ হাজার ঝেড়ে ফেলো, জ্যাক। কি বলো?'

আঁৎকে উঠল জ্যাক ডেল। 'এটা কি রকমের বিচার হলো, হেনরী? স্বীকার করছি, রানা তিনবার লাগিয়েছে, সেই জায়গায় তুমি লাগিয়েছ ছয়বার। কিন্তু মাত্র তিনটে গুলি নিয়ে তো আর ছয়বার লাগাতে পারে না। হারলাম কোন দিক থেকে?'

'ঠিক আছে, তোমার বন্ধু করুক না আরও তিনটে গুলি। আর একটা হ্যাট আনিয়ে দিচ্ছি আমি।'

আরও তিনবার হ্যাট ফুটো করতে পারবে কি পারবে না সে ব্যাপারে রানার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু সেটা কি উচিত হবে? ইয়টে উঠেই এই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে না হলেই ভাল হত। হেরে গেলে সহজ ভাবে পরাজয় মেনে নেয়া হার্স্টের পক্ষে খুবই মুশকিল হবে। রীতিমত অপমানিত হবে লোকটা। তার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন।

'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন,' বলল রানা, 'আমার বাঁ-হাতের কব্জিতে একটা ব্যথা আছে। আর গোলাগুলি ছুঁড়বার তেমন আগ্রহ বোধ করছি না। মি. হার্স্ট যদি রাজি থাকেন, আমি খেলাটা ড্র বলে মেনে নিতে রাজি আছি।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল হেনরী হার্স্ট। যেন খেলোয়াড়সুলভ উদারতা দেখাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি। অতিথিদের ওপর কোনরকম জোর খাটাতে চাই না আমি।' রানা লক্ষ করল, ওর এই পিছিয়ে যাওয়ায় হার্স্টের মুখের উপর থেকে সরে গেল একটা কালো পর্দা।

অতিথিদের মধ্যেকার চাপা উত্তেজনাটাও দূর হয়ে গেল। সবাই বুঝে নিল, প্রতিযোগিতা শেষ। কেউ কেউ যে রানার ডিপ্লোম্যাসিতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা বোঝা গেল দু'একটা টুকরো আলাপে। গগল্স্ পরা এক লাস্যময়ী মহিলা রানার শোনার পক্ষে যথেষ্ট উঁচু গলায় পাশের মোটাসোটা এক ভদ্রলোকের কানে কানে বলল, 'কোটিপতিকে হারিয়ে দেয়াটা নেহাত বোকামি, তাই না ডক্টর? সেক্ষেত্রে ড্র কেন, হার মেনে নিলেই বেশি খুশি করা যেত।'

তেমনি ফিসফিস করে, কিন্তু রানা যাতে শুনতে পায় ততটা জোরে উত্তর দিল লোকটা, 'ইজিপশিয়ান তো! মাজার জোর নেই। আর কেউ হলে শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়তো। কিন্তু এরা তা করবে না কোনদিনই। বসে যাবে আপোসের টেবিলে। সব ব্যাপারেই কম্প্রোমাইজ। এই জন্যেই দুচোখে দেখতে পারি না আমি এদের।'

'ডাক্তারের কথায় কিছু মনে কোরো না, রানা,' বলল জ্যাক ডেল। 'ওর বাপ মারা গিয়েছিল মিশর আর ইসরায়েলের যুদ্ধ-বিরতি এলাকায় দু'পক্ষের এক খণ্ডযুদ্ধের মাঝখানে পড়ে। জাতিসংঘ থেকে পাঠানো হয়েছিল তাকে সেখানে। সেই থেকে ও আরব ইসরাইলী কাউকেই দেখতে পারে না দু'চোখে। এই যে ডাক্তার, আসুন, আলাপ করিয়ে দেয়া যাক, ইনি মাসুদ রানা। আর রানা, ইনি হচ্ছেন সোফিয়ার ডাক্তার, ডক্টর জ্যাকোপো।'

আড়ষ্ট একটা হাত ঝাঁকাল রানা, চাইল তাচ্ছিল্য ভরা নীল দুই চোখের দিকে। চোখ দুটো ভেজা ভেজা। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যে সর্বদা চঞ্চল,

কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না দৃষ্টি।

সোফিয়ার ডাক্তার। এর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে রানা। গত তিন বছর ধরে আছে সে ইয়ট সোফিয়ায়। অতিরিক্ত মদাসক্তির জন্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে হার্স্টের ইয়টে চাকরি নিয়েছে এই প্রতিভাবান ইটালিয়ান ডাক্তার।

হেনরী হার্স্ট ছাড়া এই ডাক্তারই একমাত্র ব্যক্তি, যে আগাগোড়া প্রত্যেকটা লাল চিহ্ন দেয়া জায়গায় ছিল এই ইয়টে। হার্স্ট যদি না হয়ে থাকে, তাহলে খুব সম্ভব এই লোকটাই হত্যাকারী। মনে মনে ভাবল রানা একবার, গুপ্তঘাতকের সাথে হাত মেলাচ্ছে সে?

চার

এইদিকেই আসছিল হার্স্ট, কিন্তু একটা লঞ্চ এগিয়ে আসবার আওয়াজ শুনে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল সে। ছুটে গিয়ে দাঁড়াল রেলিঙের ধারে। বলল, 'নিশ্চয়ই ফিরল লরেন্সী।'

পিছন থেকে রানা লক্ষ করল হার্স্টের পিঠটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। রেলিঙটা চেপে ধরল সে আরও শক্ত করে। বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রাটল্যান্ড! মিস লরেন্সী কোথায়?'

উত্তরটা শুনতে পেল না রানা, কিন্তু খানিক বাদেই বিশাল চেহারার এক লোক উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে, কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল কোটিপতির সামনে।

লোকটাকে চেনা চেনা মনে হলো রানার, কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না হঠাৎ করে।

'চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, স্যার,' বলল রাটল্যান্ড।

'পালিয়েছে! কী বলছ তুমি গর্দভ। পালিয়েছে মানে? তোমার ওপর কি অর্ডার ছিল?'

'সব সময় সাথে থাকার,' মাথা নিচু করে বলল রাটল্যান্ড।

'তাহলে? কী রকমের বডিগার্ড তুমি? কি করে পালাল?'

বডিগার্ডের কথা শুনেই লোকটাকে চিনে ফেলল রানা। হ্যারি রাটল্যান্ড। সার্জেন্ট রাটল্যান্ড অভ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। দুর্দান্ত সাহসী ও সৎলোক বলে সুনাম ছিল। বিদেশ থেকে কোন প্রাইম মিনিস্টার বা প্রেসিডেন্ট এলে এরই উপর ভার পড়ত তাঁর নিরাপত্তার। সরকারী চাকরি ছেড়ে এই কাজ নিয়েছিল বেশি টাকার মোহে পড়ে। এখন নিশ্চয়ই সেজন্যে দুঃখ হচ্ছে ওর। দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে, জবাব নেই।

'তোমার মত গর্দভকে না পুষে একজন জি-ম্যান রাখা উচিত ছিল আমার। তাকে কিছুতেই বোকা বানাতে পারত না কেউ। পিছনে লেগে থাকার হুকুম পেলে লেগেই থাকত তারা।'

এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রাটল্যান্ড, সোজা চাইল কোটিপতির চোখের দিকে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে অপমানে। গম্ভীরভাবে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার, জি-ম্যান বা এইচ-ম্যান বা এক্স, ওয়াই, জেড ম্যান যাই হোক না কেন, কোন কোন জায়গা আছে যেখানে পুরুষ মানুষ কোন ভদ্রমহিলার পিছু নিতে পারে না। বাথরুমে ঢুকেছিল মিস লরেলী, বেরিয়ে গেছে ব্যাক ডোর দিয়ে।'

কয়েক সেকেন্ড কি বলবে ভেবে পেল না হার্স্ট, তারপর বলল, 'বেশ, বুঝলাম ও পালিয়েছে ওই ভাবে। কিন্তু তোমার অনুসরণ করা উচিত ছিল, যেমন করে হোক খুঁজে বের করা দরকার ছিল। তা না করে তুমি ফিরে এসেছ এখানে চেহারা দেখাতে। তোমার চেহারা তো দেখতে চাই না আমি, চাই লরেলীকে। কোন্ আক্কেলে তুমি ফিরে এলে শুনি? খোদাই জানে কি বিপদের মধ্যে আছে ও এখন!'

'জায়গাটার নাম পালারমো, বুঝতে পেরেছ? এটা সিসিলি—ইংল্যান্ড নয়।'

'অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, স্যার। আরও খুঁজতাম, হঠাৎ স্পীড বোটের আওয়াজ শুনে ভাবলাম ওতে করে হয়তো ফিরে এসেছে মিস লরেলী।'

'ভাবলাম...ভাবলাম!' বিদ্রূপের কষাঘাত হানল হার্স্ট। 'ভাবনা চিন্তাটা কম করো, রাটল্যান্ড, কাজে মন দাও। ফিরে আসেনি, দেখলে তো? এবার যাও। এক্ষুণি ফিরে যাও। খুঁজে বের করো ওকে। যেমন করে পারো। যাও।'

'তার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না,' হঠাৎ খনখনে গলায় বলে উঠল ডক্টর জ্যাকোপো। 'এই বোটে আমার লরেলী মাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে! দেখো তো, হেনরি, বিনকিউলারটা লাগিয়ে দেখো।'

ঝট করে সবাই ফিরল সাগরের দিকে। বন্দরের দিক থেকে একটা নৌকো আসছে ঠিকই। অনেক দূরে আছে নৌকোটা এখনও। এত দূর থেকে কাউকে চিনতে পারার কথা নয়। শুধু বোঝা যাচ্ছে দু'তিনজন আরোহীর মধ্যে একজনের গায়ে লাল জামা আছে—ছেলে না মেয়ে বোঝার উপায় নেই।

রেলিঙের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে আঁটা একটা খাপ থেকে একখানা শক্তিশালী বিনকিউলার বের করে ফেলল হার্স্ট ব্যস্ত হাতে। ঝট করে সেটা চোখে তুলে দু'তিন সেকেন্ড ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। উদ্বিগ্ন মুখে ফুটে উঠল প্রশান্ত হাসি।

'ঠিক বলছ, ডাক্তার। লরেলীই। থ্যাংক গড!'

ট্রে হাতে এগিয়ে এল স্টুয়ার্ড। একটা গ্লাস তুলে নিল রানা। সিগারেট ধরাল একটা। ভাবছে, স্নেহ-মমতা ভরা পিতার চরিত্রের সাথে নির্মম চরিত্র খাপ খাওয়ানো বড়ই কঠিন। কিন্তু এটাই বা কেমন, সর্বক্ষণ মদে চুর হয়ে আছে যে লোক, সেই জ্যাকোপোর চোখের দৃষ্টি এতটা ভাল থাকে কি করে?

'খুব তো তেলিং হলো,' গগল্‌স্ পরা মহিলা হার্স্ট যাতে শুনতে না পায় এমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলল ডাক্তারের কানে কানে। 'কিন্তু যাই বলুন, ডক্টর, মেয়েটা

হয়েছে একেবারে পাজির পা ঝাড়া। দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, আসলে কাঁটা পর্যন্ত গিলে ফেলে।'

কোন উত্তর না দিয়ে ডাক্তার একবার আপাদমস্তক দেখল লাস্যময়ীকে, তারপর মনোনিবেশ করল শ্যাম্পেনের গ্লাসে। রানা বুঝল, এই কটুভাষিণীকে বেশিক্ষণ সহ্য করা মিশর বিদ্বেষী জ্যাকোপোর পক্ষেও মুশকিল।

কম্পেনিয়ান ল্যাডার বেয়ে লরেলী যখন উপরে উঠে এল, প্রথম দর্শনে রানার মনে হলো বুঝি তেরো চোদ্দ বছর বয়সের মেয়ে। কিন্তু পর মুহূর্তে ভুল ভাঙল। চুল ছাঁটার ভঙ্গির জন্যে ও রকম মনে হয়, আসলে একুশ বাইশ। তাছাড়া চালচলনে একটা শিশুসুলভ সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি আছে বলে বয়স কম মনে হয়। কাজল-কালো চোখ, মুখে সবসময় লেগে আছে উচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, চুলের রঙ দুর্লভ ভেনিশিয়ান রেড। টগবগ করে ফুটছে প্রাণ চাঞ্চল্যে।

ভালবেসে এক ইটানিয়ান অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিল হেনরী হার্স্ট। সোফিয়া পেডোনি। লরেলীকে তিন বছরের রেখে মারা যায় সোফিয়া। শিকারের প্রতি আগ্রহ ছিল আগে থেকেই, স্ত্রীর মৃত্যুর পর একেবারে ঘোর শিকারী হয়ে গেল হার্স্ট। আর বিয়ে থা করেনি। মেয়েটা ওর চোখের মণি।

হাসিখুশি মেয়েটাকে বেশ ভাল লাগল রানার। ওকে দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে ক্ষুধা, দুঃখ, যন্ত্রণা বলে কিছুই নেই, শরতের হালকা মেঘের মত ভেসে চলেছে সে যেদিকে খুশি। বল্গাহারা, ভাবনাহীন।

'হাই, ড্যাড!' চেঁচিয়ে উঠল লরেলী। 'হাই, রাটল্যান্ড!' বাপের দিকে ফিরে বলল, 'ওর কোন দোষ নেই, ড্যাড। নিজের ভুলেই হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। টয়লেটে দুটো দরজা ছিল, ভুল করে উল্টো দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'লরেলী, আবার তুমি ভাবনায় ফেলেছিলে আমাকে। তুমি জানো এই বন্দরে আমি চাই না তুমি একা চলাফেরা করো!'

'আই, ড্যাড। তুমি সব কিছুতেই বড় বেশি দুশ্চিন্তা করো। কি হবে আমার? আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি। তাছাড়া পালারমোর মত আধুনিক একটা শহরে দিন দুপুরে কি অঘটন ঘটতে পারে? পুলিস আছে...'

'মাফিয়াও আছে,' কড়া গলায় বলল হার্স্ট। 'আর আছে সাইমন পাসেরো। তোমার পরম প্রিয় পুলিস বাহিনী আজ পর্যন্ত তার টিকিটাও স্পর্শ করতে পারেনি। ওর হাতে পড়লে কি হত ভাল করেই জানা আছে তোমার। কত টাকা যে মুক্তিপণ দাবি করে বসত খোদাই জানে!'

কোটিপতির সনাতন কিডন্যাপিঙের ভয়। পরিবারের কাউকে ধরে রেখে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের ভয়। আসল ভয়, টাকা দেবার পরেও প্রিয়জনকে আর ফিরে না পাওয়ার সম্ভাবনা।

'যাই বলো, ড্যাড, লোকটা কিন্তু দারুণ! এই সাইমন পাসেরো।' আবদারের সুরে বলল, 'লোকটাকে একদিন ইয়টে দাওয়াত করো না, ড্যাড? ওকে দেখতে পেলে জীবন সার্থক হত। আসবে না ডাকলে? ওর দেখা পেলে...'

'সিসিলির পুলিসও ধন্য হয়ে যেত!' চোখ পাকিয়ে বলল হার্স্ট। 'রাইফেলটা ওর বুকের দিকে ধরা অবস্থায় আমি ওর সাথে দেখা করতে রাজি আছি।'

'তুমি কিচ্ছু জানো না, ড্যাড। ও এদেশের রবিন হুড। শুনলাম, ওকে এখন "টুরিডো" বলে ডাকতে শুরু করেছে সিসিলির লোকেরা। দস্যু বেপ্পো পাসেল্লীকে এই নামে ডাকা হত।'

ভ্রূ কুঁচকে মেয়ের দিকে চাইল হেনরী হার্স্ট।

'অনেক কিছু শুনেছ দেখা যাচ্ছে? চোরের কাহিনী শুনিয়ে কে তোমাকে মুগ্ধ করল জানতে পারি?'

হঠাৎ মুখের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল লরেলীর।

'আরে! ভুলেই গিয়েছিলাম! দারুণ এক লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার। তোমার সাথেও আলাপ করিয়ে দেব। খুব ভাল লাগবে তোমার, দেখো! অদ্ভুত লোক!'

'কি ধরনের অদ্ভুত লোক শোনা যাক,' বলল হার্স্ট। 'বাউণ্ডুলে?'

'না না, তুমি যা ভাবছ তা না, ড্যাড। প্রফেসার খুব মজার লোক।'

'প্রফেসার?'

'হ্যাঁ! প্রফেসার ফেরেনসি। উনি একজন আর্ক···আর্চ···আর্কি···, মানে, মাটি খুঁড়ে পুরানো কালের জিনিসপত্র বের করে। সিসিলির জন্ম ইতিহাস পর্যন্ত জানা আছে ওর। ওরেব্বাপ! পণ্ডিত লোক!'

হার্স্টের উত্তরটা শুনতে পেল না রানা। দারুণ বেগে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে ওর মাথার ভিতর।

প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসি। এর সম্পর্কে শুনে এসেছে সে ঢাকার অফিস থেকে। সত্যিই আর্কিয়োলজিস্ট, সত্যিই প্রফেসার, কিন্তু এর সাথে আরও খানিকটা সত্য রয়েছে, যেটা সবাই জানে না। অত্যন্ত গোপনে মাফিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে সাহায্য করছেন তিনি গত দু'বছর ধরে। মেজর জেনারেল রাহাত খানের মুখে শুনেছে সে—খুব সম্ভব হত্যাকারীর পরবর্তী টার্গেট হতে যাচ্ছে প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসি।

'একে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে তুমি,' বলেছিলেন মেজর জেনারেল।

'তার মানে এর ওপর নজর রাখলেই বোঝা যাবে কে আক্রমণ করছে?' বলেছিল রানা। 'একে রক্ষা করবার দায়িত্বও কি আমার?'

মাথা নেড়েছিলেন মেজর জেনারেল। ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল এক টুকরো হাসি। বলেছিলেন, 'না। মাফিয়া না মারলে আমরাই মারতাম ওকে। ডাবল গেম খেলছিল লোকটা এতদিন। দু'মুখো সাপ। দু'পক্ষ থেকেই খসাচ্ছিল প্রচুর টাকা। যখন টের পেলাম তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। আমরা আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ না করে ফেরেনসির দ্বৈত-আনুগত্যের কথা কৌশলে তুলে দিয়েছি মাফিয়ার কানে। এর ফলে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে তোমার।'

দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিল রানাও। কেউ দেখতে পারে না দু'মুখো সাপকে। বড় ঘৃণ্য এদের জীবন। বড় নির্মম মৃত্যু ঘটে এদের।

'কি বললে? জর্জিয়ো ফেরেনসি?' ডক্টর জ্যাকোপো হাঁক ছাড়ল হঠাৎ খনখনে গলায়। 'ব্যাটা তাহলে এখন পালারমোয়? নেমে গিয়ে একবার দেখা করে আসা দরকার।'

'তুমি চেনো ওকে, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল হার্স্ট। 'কেমন লোক?'

'আমার মতই। ভাল।' বলল ডাক্তার। 'দারুণ পণ্ডিত। মিশরের পিরামিডের ওপর মূল্যবান গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. নিয়েছিল। আমার চেয়ে দুই-এক বছরের জুনিয়ার, কিন্তু...'

'ঠিক আছে,' ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে বলল হার্স্ট। 'তাহলে ডিনারে ডাকা যায়, কি বলো? একটা নেমন্তন্ন পাঠিয়ে দেব আজই।'

মৃত্যুর দাওয়া! ভাবল রানা। হার্স্টের এই হঠাৎ আগ্রহটা সন্দেহজনক। তেমনি সন্দেহজনক ডক্টর জ্যাকোপোর সাথে জর্জিয়ো ফেরেনসির পূর্ব-পরিচয়।

'আর্কিওলজির প্রফেসার মাফিয়ার গুণ্ডাদের সম্পর্কে কি গল্প শুনিয়েছে তোমাকে?' মেয়ের দিকে ফিরল হেনরী হার্স্ট।

'ওর কাছে সব-খবর আছে,' বলল লরেলী। 'মাটি খোঁড়ার কাজে ওকে স্থানীয় লোক লাগাতেই হয়, তাদের কাছ থেকেই জানা যায় সাইমন পাসেরোর আশ্চর্য সব কাহিনী। সব জানে ওরা, কিন্তু বলে না পুলিসকে।' উৎসাহে চকচক করছে লরেলীর চোখ।

ডিং ডিং করে বেজে উঠল ডালসিমার। সিঁড়ি বেয়ে একজন স্টুয়ার্ড উঠে এল উপরে।

'দশ মিনিট পর লাঞ্চ,' বলল হার্স্ট রানাকে উদ্দেশ্য করে। 'চলুন, তৈরি হয়ে নেয়া যাক।'

সবাই যার যার কেবিনে নামার জন্যে উঠে পড়ল। রানাকে ওর জন্যে নির্ধারিত কেবিনে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিল হার্স্ট স্টুয়ার্ডকে। সবার সাথে রানাও নেমে গেল ডেক থেকে ইয়টের অভ্যন্তরে।

ভরপেট খেলো সবাই। অপূর্ব রান্না, ছিমছাম পরিবেশ।

খাওয়ার টেবিলে প্রত্যেক অতিথিকে ভাল করে লক্ষ করল রানা। নতুনত্ব কিছুই পেল না সে এদের মধ্যে। পৃথিবীর সবখানে কোটিপতিরা খাওয়ার ব্যাপারে যেমন লোভী, জীবনের প্রতি যেমন বিতৃষ্ণ, এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। রানা ভাবল, এতগুলো লোক কেন এসে জুটেছে এই ইয়টে? ওরা কি খুব মজা পাচ্ছে? তা নয়। এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই ওদের। হেনরী হার্স্টের প্রেমে পড়ে যে ওরা এখানে এসেছে তা-ও মনে হয় না। হার্স্টকে বেশির ভাগ লোক হয়তো পছন্দই করে না। তবু নিয়ম মাফিক চলছে সবকিছু। ওরা এখানে এসেছে বছরের এই সময়টায় ওদের মৌজে রাখার দায়িত্ব হার্স্টের উপর, তাই। অন্য সময় ওরা একেকজন একেক বার হোস্ট সাজে। এই ভাবেই কেটে যায় অসহ্য অখণ্ড অবসর।

রানা লক্ষ করল হার্স্ট তেমন কিছু খেলো না। দুটো কারণ থাকতে পারে এর। শরীরটাকে ফিট রাখার জন্য হয়তো এই বয়সে একটু ডায়েটিং করছে কোটিপতি। কিংবা যাকে হত্যা করতে হবে সে লোকটা খুব কাছেই আছে জেনে উত্তেজনায় মন দিতে পারছে না খাওয়ায়। মনের মধ্যে উত্তেজনা থাকলে খাওয়ার রুচি থাকে না। অন্য এক ছন্দ নাচতে থাকে রক্তের মধ্যে।

লাঞ্চের পর প্রায় সবাই আবার উঠে এল ডেকের উপর।

'আমি চললাম,' বলল ডাক্তার। 'যাই, দেখা করে আসি প্রফেসারের সাথে। ওকে কি আজ রাতে ডিনারের জন্যে নিমন্ত্রণ করতে হবে তোমার হয়ে, হেনরী?'

'হ্যাঁ। প্লীজ!' বলল হার্স্ট। 'মেয়েটা যখন ওকে পছন্দ করেছে, আসুক না। তাছাড়া আমার কিছু কালেকশন আছে, নানান জায়গা থেকে নানান জিনিস জুটিয়েছি—কোনটা কত সালে কি জিনিস তার একটা লিস্ট তৈরি করিয়ে নেয়া যাবে ওকে দিয়ে।'

'আমি আপনার সাথে যেতে পারি,' বলল রানা চট করে। 'হয়তো একটা ফিল্মের মেটেরিয়াল পেয়ে যেতে পারি ওখানে। টিভিওয়ালারা অ্যান্টিকুইটির জন্যে ভাল পয়সা দেয় আজকাল।'

'এইজন্যে আপনাদেরকে দেখতে পারি না আমি,' বলল ডক্টর জ্যাকোপো। কিন্তু বলেই হাসল সে। 'সব সময় সব কিছুতে নাক গলানো চাই আপনাদের। চলে আসুন, যদি যেতে চান।'

লোকটার ঠোঁট কাটা। কোন কথা আটকায় না মুখে। রানাকে পছন্দ করতে পারছে না সে কিছুতেই। কিন্তু রানাও নাছোড়বান্দা। এই রকম দুর্ব্যবহারের একটা কারণ হতে পারে, হত্যার কোন সাক্ষী রাখতে চায় না লোকটা। সে সুযোগ দেয়া যাবে না একে।

রানা জানে, যাকে হত্যা করা হবে তার মাথার উপর নেমে আসবে ভারী কিছু। প্রত্যেকটা হত্যারই পদ্ধতি এক। একেক জন একেক ভাবে মরেছে, কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই উপর থেকে ভারী কিছু নেমে এসেছে নিহতের মাথার উপর। জ্যাকোপো যদি হত্যাকারী হয়ে থাকে, তাহলে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে।

শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে প্রফেসার ফেরেনসির কার্যক্ষেত্র। জায়গাটা উঁচুনিচু, পাহাড়ী। একটা উপত্যকার মাঝখানে খোঁড়া হচ্ছে। আশপাশে কমলা আর জলপাইয়ের বাগান। ফলের ভারে নুয়ে রয়েছে কমলালেবুর দুর্বল গাছগুলো। ফলের মিষ্টি একটা গন্ধে বাতাস ভারী।

চারকোনা করে মাটি কেটে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে গুহা। গুহামুখের গজ পঞ্চাশেক পুবে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরের সামনে কিছু প্রাচীন পটারি পরীক্ষা করছে একজন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা তরুণ।

'আমি জন ক্রেইগ,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল লোকটা রানাদের এগিয়ে আসতে দেখে। 'কাকে চান?

'আমি প্রফেসার ফেরেনসির পুরানো বন্ধু,' বলল জ্যাকোপো। 'হঠাৎ শুনলাম উনি এখানে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করছেন। ভাবলাম চলে যাব দু'একদিনের মধ্যে, দেখাটা সেরেই যাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জন ক্রেইগ। ছড়ানো ছিটানো জিনিসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমি এখন ক্লাসিফাই করছি। উনি আছেন গুহার ভেতর। খুঁজে নিতে পারবেন না? আমার আসতে হবে?'

'না, না। আপনি কাজ করুন,' বলেই গুহার দিকে হাঁটতে শুরু করল ডক্টর জ্যাকোপো।

একটু ক্যামেরাম্যানগিরি করা দরকার এখানে, ভেবে ক্যামেরাটা তুলতে যাচ্ছিল রানা, মাথা নেড়ে বারণ করল ছোকরা গবেষক।

'এখন দয়া করে ছবি তুলবেন না,' বলল সে। 'আগে সর্টিং হয়ে যাক, তারপর।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যামেরা নামিয়ে নিল রানা। তারপর অনুসরণ করল ডাক্তারকে।

গুহামুখটা মাটির। কাঠের তক্তা দিয়ে ঠেকা দেয়া আছে চারপাশের দেয়াল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই পাথর দেখতে পেল রানা। ভলকানিক সয়েল—ভাবল সে। আগ্নেয়গিরির নিচে চাপা পড়া কোন শহর পেয়ে গেছে খুব সম্ভব ফেরেনসি। হয়তো প্রাচীন কোন ফিনিশিয়ান দালান পেয়ে গেছে।

গুহার ভিতর কিছুদূর পর পর শেডবিহীন একশো পাওয়ারের বালব ঝুলছে ছাত থেকে। বেশ কিছুদূর এগিয়ে দেখল রানা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে গুহাপথ। ডাক্তার কোন্ পথে গেছে বোঝার চেষ্টা করল সে থেমে দাঁড়িয়ে, কান খাড়া করে কথাবার্তার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

'ডক্টর জ্যাকোপো!' হাঁক ছাড়ল রানা। 'প্রফেসার ফেরেনসি!' পাঁচ সেকেন্ড কোন জবাব নেই। চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ অতর্কিতে ডান দিকের গুহা থেকে ছুটে এল গরম দমকা বাতাস। সেই সাথে গুড়গুড় করে উঠল একটা বিস্ফোরণ-ধ্বনি। পরমুহূর্তে শক-ওয়েভ অনুভব করল রানা। প্রচণ্ড ধাক্কা।

ছিটকে গিয়ে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল ও।

বুঝতে পারল দেরি করে ফেলেছে সে। খুব সম্ভব মারা গেছে প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসি।

পাঁচ

শক-ওয়েভের পরপরই এল লো-প্রেশার-ওয়েভ। ফুসফুস থেকে প্রায় সবটা বাতাস বেরিয়ে গেল রানার। দাঁতে দাঁত চেপে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল

সে। ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল। তারপর এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

ডান দিকের গুহাপথ ধরে টলতে টলতে এগোল রানা।

কিছুদূর এগিয়ে বুঝতে পারল, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না সে। বিস্ফোরণে সমস্ত লাইট নিভে গেছে। পকেট হাতড়ে লাইটারটা বের করল সে। কায়দা করে ছোট একটা টর্চ ভরে দেয়া আছে লাইটারের মধ্যে। ওরই ভিতর রয়েছে রি-চার্জেবল্ ব্যাটারি। বার চারেক সিগারেট ধরালেই পুরো চার্জ হয়ে যায় ব্যাটারি। ছোট্ট টর্চের সরু এক চিলতে আলোর সাহায্যে এবার সামান্য একটু দ্রুত হলো রানার চলার গতি। ধোঁয়া আর ধূলিকণার আস্তরণ ভেদ করে বেশি দূর যেতে পারছে না টর্চের আলো—হোঁচট বা ঠোকর খাওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে, এই যা।

একটা মোড় নিয়েই অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে কে যেন।

'হেল্প! হেল্প!'

খুব বেশি দূরে নয়, কিন্তু চাপা গলায়, হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকছে কেউ। দ্রুতপায়ে এগোল রানা। আর একটা মোড় ঘুরেই দেখতে পেল সে ডক্টর জ্যাকোপোকে। টর্চের আবছা আলোয় দেখা গেল দাঁতে দাঁত চেপে একটা বড়সড় পাথরের খণ্ড উঁচু করে ঠেলে রাখার চেষ্টা করছে জ্যাকোপো। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর চোখ।

'জলদি!' চেহারা বিকৃত করে বলল জ্যাকোপো। 'চাপা পড়েছে ফেরেনসি।'

জানা কথা, এই চাপা পড়ার জন্যে দায়ী জ্যাকোপো নিজেই, বিস্ফোরণটাও ঘটিয়েছে সে-ই। রানার উচিত ছিল একটা পাথর তুলে জ্যাকোপোর মাথাটা থেঁতলে দেয়া। তাহলে সব কাজ খতম করে আজই নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরতে পারত সে। কিন্তু তা না করে চট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে জ্যাকোপোর পাশে, পাথরের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল একটা হাত। দুই সেকেন্ড হাতড়ে ফেরেনসির গলার কাছে পাল্‌স্ পেল রানা।

বেঁচে আছে ফেরেনসি!

যদিও এই লোকটাকে উদ্ধার করার কোন মানেই হয় না, আজ উদ্ধার করলে মারা যাবে কাল বা পরশু অন্য কোন ভাবে, তবু উদ্ধারের কাজে লেগে গেল রানা সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

ঠেলে একটা কাঁধ ঢুকিয়ে দিল রানা পাথর খণ্ডের নিচে। এতক্ষণ ওটা ধরে রাখতে গিয়ে চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল ডক্টর জ্যাকোপোর, এবার ঝেড়ে দিয়ে সে-ও কাঁধ লাগাল। ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল প্রকাণ্ড পাথরটা। রানার পিঠে চোখা কি যেন বিঁধছে, পেশীগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, টপটপ ঘাম ঝরছে থুতনি বেয়ে—কিন্তু হাল ছাড়ল না সে কিছুতেই। কয়েক মন ওজনের পাথরটা এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি করে উঠে গেল ছয় ইঞ্চি। প্রচণ্ড চাপে বাঁকা হয়ে গেছে ওর পিঠ।

'দশ সেকেন্ড ধরে রাখতে পারবেন না?' জিজ্ঞেস করল ডক্টর জ্যাকোপো।

রানা দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকাতেই নিচু হয়ে ঢুকে পড়ল ডাক্তার পাথরের নিচে। ছেঁচড়ে টেনে বের করে আনল প্রফেসারের জ্ঞানহীন দেহটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বের করে এনেছি। এবার নামাতে পারেন।'

ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল রানা পাথরটা। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। রুমাল বের করে ঘাম মুছল।

একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকল না ওর। ফেরেনসিকে বাঁচাল কেন জ্যাকোপো? তার মানে কি ওকে হিসেবের বাইরে রাখা যায়? তাহলে কি হেনরী হার্স্টই হত্যাকারী? তাই যদি হয় তাহলে তার পক্ষে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা কি করে সম্ভব?

'গ্যাস পকেট,' বলল প্রফেসার ফেরেনসি। 'এর মানে আর কিচ্ছু না…গ্যাস-পকেট। গেছিলাম আর একটু হলে! নেহাত কপাল গুণে প্রাণে বেঁচে গেছি। আপনি হঠাৎ উপস্থিত না হলে নির্ঘাত মারা পড়তাম, ডক্টর। আর আপনিও,' রানার দিকে ফিরল ফেরেনসি। 'আপনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, মিস্টার… ম্‌ম্‌…'

'রানা। মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ।'

লোকটা সত্যিই ব্যাপারটাকে গ্যাস লিকেজ বলে মনে করে কিনা বোঝা গেল না। মাটির নিচে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে টানেলের মধ্যে গ্যাস জমে থাকে ঠিকই, কিন্তু প্লাস্টিকের গন্ধটা ওর নাকে যায়নি, এটা কি সম্ভব? প্লাস্টিক বম্বের প্রকট গন্ধটা তো প্রফেসারের অন্তত চিনতে পারার কথা! রানা জানে, এই প্রফেসারের নাক টিপলে ঘি পড়বে। ওর মত হুঁশিয়ার লোক ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজছে কেন?

কুঁড়েঘরে একটা ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আছে প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসি। চীফকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখে নিজের কাজে ফিরে গেছে জন ক্রেইগ, দুনিয়াদারির সব চিন্তা ভুলে গভীর মনোযোগের সাথে সর্ট করছে ভাঙা আধ ভাঙা মহা-মূল্যবান পটারিগুলো।

'ভাবলাম, কাল সকালে লেবারদের কাজে লাগাবার আগে আমার একবার স্ট্র্যাটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার,' বলল প্রফেসার। 'যেই না লাইটের সুইচটা টিপেছি, ওমনি ভিড়িম্‌! নিশ্চয়ই তারের কোথাও ব্যাড-কানেকশন ছিল, সুইচ অন করতেই স্পার্ক করেছিল—ব্যস, আগুন ধরে গিয়েছিল জমে থাকা গ্যাসে।'

মনে মনে রানা ভাবল, আসলে ছাতের সাথে ফিট করা বোমার সাথে জোড়া ডিটোনেটারের টার্মিন্যালের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চালু হয়ে গিয়েছিল সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে। পদ্ধতির পরিবর্তন করেনি হত্যাকারী। উপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে আসবে ভারী কিছু। ব্যাপারটাকে মনে হবে নিছক দুর্ঘটনা।

ভাল ট্রেনিং পেয়েছে লোকটা। অবশ্য ট্রেনিং না পেয়ে কারও পক্ষে সার্থক গুপ্তঘাতক হওয়া সম্ভব নয়। এক্সটার্মিনেশন যার তার কাজ নয়। প্রফেশনাল কাজ।

প্রফেসারকে ভালমত চেকাপ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল জ্যাকোপো।

'দু' এক জায়গায় ছড়ে-ছিলে গেছে, তাছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবু তোমাকে একবার হাসপাতালে গিয়ে থরো চেকাপ করাবার কথা বলতাম, যদি এসব হাসপাতালের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা থাকত আমার। কিন্তু শক যেটা খেয়েছ, তার জন্যে তোমার কয়েকটা দিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। হাসপাতালে যাবে, না ইয়টে?'

'ইয়টে? ঠিক বুঝতে পারলাম না, ডক্টর।' অবাক হয়ে জ্যাকোপোর মুখের দিকে চাইল ফেরেনসি।

'হেনরী হার্স্টের ইয়টে আছি আমি। সোফিয়ার ডাক্তার। তোমাকে আজ ডিনারের নিমন্ত্রণ করতে বলে দিয়েছিল হেনরী। ইচ্ছে করলে কিছুদিন বেড়িয়েও আসতে পারো ওখান থেকে।'

'হার্স্ট? ওহ্-হো! সকালে যে মিষ্টি মেয়েটা এসেছিল, তার বাবা। মন্দ হয় না, কি বলেন? কিন্তু ডিনারের দাওয়াতে একেবারে সুটকেস নিয়ে গিয়ে হাজির হলে কেমন দেখাবে? কিছুদিন আরাম আয়েসে কাটিয়ে আসতে পারলে দারুণ হত, কিন্তু আপনার বন্ধু...'

'বন্ধু নয়, মনিব,' বলল জ্যাকোপো। 'কিন্তু খুবই ভাল লোক। তুমি গেলে বরং খুশিই হবে।'

জন ক্রেইগের উপর খোঁড়াখুঁড়ির সব ভার দিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা তিনজন। পুরানো শহরের গলি-ঘুঁচি পেরিয়ে চলে এল খোলামেলা বন্দরের প্রশস্ত রাস্তায়। সারি সারি আধুনিক বাংলো, হোটেল, দোকানপাট, গগনচুম্বী অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস আর অফিস-বিল্ডিং দেখতে দেখতে পৌঁছুল জেটিতে।

শুকনো-পাতলা হাড্ডিসার প্রতিভাবান চেহারা জর্জিয়ো ফেরেনসির। সর্বক্ষণ বকবক করতে করতে চলল। যেটার উপরই চোখ পড়ে সেটার উপরই তার কিছু বক্তব্য আছে। সেইসাথে আছে অন্যান্য আর্কিয়োলজিস্টদের বক্তব্য খণ্ডনের দুর্দমনীয় স্পৃহা। উটের মত ধীর, কষ্টসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে সে।

চলেছে মৃত্যুর দিকে।

ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারল না রানা ওর মাথার মধ্যে কি চলছে। ও কি টের পেয়েছে যে ওকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হত্যাকারী? ও কি জানে না যে গুহার বিস্ফোরণটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়?

সত্যিই অত্যন্ত ভদ্রভাবে প্রফেসারকে গ্রহণ করল হেনরী হার্স্ট। ব্যাপারটা শুনে ধন্যবাদ দিল ডাক্তারকে, বুদ্ধি করে ওকে অতিথি হিসেবে নিয়ে আসার জন্যে। ফেরেনসিকে দেয়া হলো রানার পাশের কেবিন।

খুশি হলো রানা। ওর অজান্তে কারও পক্ষে প্রফেসারের কেবিনে ঢোকা

অসম্ভব। ব্যবস্থা সাথেই রয়েছে।

কেবিনের দরজা ভিতর থেকে আটকে দিয়ে ক্যামেরার বাক্স খুলল রানা। একটা ক্যামেরার নিচের একটা স্ক্রু খুলতেই ছোট্ট ক্যাপসুলের মত দুটো লম্বাটে গোল জিনিস পড়ল রানার হাতের তালুতে। মিনি রেডিও। একটা ট্র্যান্সমিটার, একটা রিসিভার। খুঁজে পেতে ডানদিকের দেয়ালের গায়ে বসানো ওয়ার্ড্রোবের ভিতর পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল সে। একটা স্টীল লাইনিঙের গায়ে খাড়া হয়ে আটকে গেল ট্র্যান্সমিটারটা ভিতরে বসানো চুম্বকের টানে।

ব্যস, এবার ঘুমাবার সময় দ্বিতীয় ক্যাপসুলটা বালিশের নিচে রেখে দিলেই হলো। পাশের ঘরে একটু শব্দ হলেই অ্যালার্ম-হুইসেল শুনে জেগে যাবে রানা। প্রত্যেকটা কথাবার্তা শুনতে পাবে পরিষ্কার। যদি কোন গোলমাল না হয়, মিনি রেডিওগুলোও কোন গোলমাল করবে না—নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে সে নিজেও।

ডালসিমারের বাদ্য শুনে বোঝা গেল ডিনারের সময় হয়ে এসেছে।

দামী একটা ডিনার স্যুট পরে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা কেবিন থেকে।

সোফিয়ার আর সব কিছুর মতই লাঞ্চটাও যেমন অপূর্ব, তেমনি অপূর্ব ডিনার। ক্যাভিয়ারের সাথে চমৎকার সাওয়ার ক্রীম সস্, ক্যানেটন আলো প্রেসির সাথে অ্যাসপ্যারাগাস টিপসের ডিশ। প্রচুর শ্যাম্পেন। সেই সাথে মুখরোচক আলাপ।

এক পিনে আশি রেকর্ড বাজাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বেশ জমিয়ে ফেলেছে প্রফেসার। তার এক একটা চমকপ্রদ রসিকতায় হাসতে হাসতে খিল ধরে যাচ্ছে কোটিপতিদের দামী স্ফীত উদরে, মহিলাদের গ্লাস থেকে ছলকে পড়ছে শ্যাম্পেন হাসির দমকে। বহুদিন পর জমজমাট আসরী লোক পেয়ে সবাই খুশি। পানের মাত্রা চড়িয়ে দিয়েছে সবাই। ইতোমধ্যেই ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠেছে ডক্টর জ্যাকোপোর দু'চোখ। বুঁদ হয়ে গেছে সে।

রূপালী একটা লো-কাট দামী পোশাক পরেছে লরেলী। পরীর মত দেখাচ্ছে ওকে। একটু বেশি পান করে ফেলায় লালচে লাগছে ওকে দেখতে।

ভয়ে ভয়ে মেয়ের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে হেনরী হার্স্ট। ভয়—কখন কি বলতে কি বলে বসবে। মা-হারা সন্তানকে টেবিল ম্যানার্স শেখাবার সুযোগ হয়নি হার্স্টের। শিকার নিয়ে এত মগ্ন থেকেছে সে যে মেয়েকে সেরা স্কুল-হোস্টেলে রেখে মানুষ করতে হয়েছে। ফলে শুধু লেখাপড়াই নয়, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কাপড়ের ফ্যাশন থেকে নিয়ে সবকিছু শিখতে হয়েছে ওর স্কুল হোস্টেলের সহপাঠিনীদের কাছ থেকে। কতটা কি শিখেছে জানার উপায় নেই হার্স্টের, তাই সব সময় ভয়, বেখাপ্পা কিছু করে বসে হাস্যাস্পদ না হয় মেয়েটা সবার কাছে।

'নিশ্চয়ই! মাফিয়ার অনেককে চিনি আমি,' জোরের সাথে বলল প্রফেসার ফেরেনসি। 'সিসিলিতে এক বছর থাকবেন, অথচ ওদের কাউকে চিনবেন না, এটা অসম্ভব। পরিচয় হতেই হবে।' হার্স্টের দেয়া প্রকাণ্ড হোয়ো ডি মন্টেরিজ

চুরুটে গোটা দুই টান দিয়ে নড়েচড়ে জমে বসল সে। 'আসলে ওদের সাহায্য ছাড়া এখানে আমার কোন কাজ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। শহর এলাকার বাইরে আইনের শাসন কোথাও পাবেন না সিসিলিতে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে থানা আছে, তার রাইফেলের শুটিং রেঞ্জ পর্যন্ত আছে আইনের শাসন। বাদ বাকি সবখানে মাফিয়ার আইন। এই তো, তিনদিন আগেও, ওরা আমার কাছে এসেছিল চাঁদার হার নিয়ে দর কষাকষি করতে।'

'চাঁদার হার মানে?' চোখ কপালে উঠল একজন মোটাসোটা কোটিপতির। 'আপনি টাকা দিচ্ছেন ওদের?'

'মারা পড়ার চেয়ে টাকা দেয়াটা অনেক ভাল না?' পাল্টা প্রশ্ন করল প্রফেসার। 'অনেক ভাল। তাছাড়া শুধু শুধু যে টাকা নেয় তা নয়—কিছু কিছু কাজও করে দেয় মাফিয়া আমার। আরও দুটো সাইট খুঁজে দিয়েছে ওরা আমাকে। তাছাড়া আরও সুবিধে আছে। আমার ওখানে কোন শ্রমিক ধর্মঘট নেই, কাজে গাফিলতি নেই, সবচেয়ে বড় কথা, চুরি নেই। একেবারে নিল্! সাইট ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যান, যতদিন পর ইচ্ছে ফিরে আসুন, যেখানে যা রেখে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে ঠিক সেখানেই সেটা পাবেন। কেউ ছোঁবে না। সাহসই পাবে না কেউ। শ্রমিকদের ধারণা সবখানে চোখ আছে মাফিয়ার। এই সবকিছু হিসেব করে দেখলে ওদের টাকা দেয়াই আমার জন্যে লাভজনক।'

'আচ্ছা!' হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এল লরেলী। লাল চুল সরাল চোখের উপর থেকে। উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে গেছে ওর চোখ। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'গুহার মধ্যে বিস্ফোরণটা বোধহয় ওদের কাজ! হয়তো আপনাকে সাবধান করে দেয়া হলো, আভাস দেয়া হলো আপনার আরও টাকা দেয়া উচিত।'

স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রফেসার ফেরেনসির মুখটা।

'ওটা হয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাস পকেটের জন্যে। আর কিছু না। মাইনার বা আর্কিয়োলজিস্টের জীবনে এটা খুব অদ্ভুত কোন ঘটনা নয়—প্রায়ই হয় এ রকম। তাছাড়া কেউ দেখতে পেল না, একটা লোক গুহার ভেতর ঢুকে বোম ফিট করে এল, এটা একেবারেই অসম্ভব। না, না, কিচ্ছু না, ওটা সাধারণ একটা গ্যাস বিস্ফোরণ।'

বলবার ধরন দেখে রানার মনে হলো, শুধু শ্রোতাদেরই নয়, নিজেকেও কথাটা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছে ফেরেনসি। নিজের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর।

ফেরেনসির জবাব শুনে যারপর নাই হতাশ হলো লরেলী। বলল, 'তা হতে পারে কিন্তু গ্যাস লিক না হয়ে মাফিয়া যদি আপনাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিত, তাহলে ব্যাপারটা দারুণ চমকদার হত। তাই না? না, মানে, মারা যেতেন না, ধরুন, শুধু একটা হাত বা পা উড়ে গেল, কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিন্তু বোমাটা মাফিয়ার হতে হবে। গ্যাস লিক তো যেখানে সেখানেই হতে পারে, ওর মধ্যে চমক কোথায়? কিন্তু মাফিয়া···আচ্ছা, প্রফেসার, পাসেরোর সাথে আলাপ আছে আপনার? সাইমন পাসেরো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ফেরেনসি। 'আলাপ করার আগ্রহও নেই। বড় ভয়ঙ্কর লোক ও। আমি যাদের সাথে কাজ কারবার করি তারা ওর তুলনায় দুধে ধোয়া গোলাপ ফুল। সাদামাঠা ভদ্রলোক।'

মাথা দুলিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত আহলাদী ভঙ্গিতে বলল লরেলী, 'আমার আগ্রহ আছে বাবা! ওকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেও জীবনটা সার্থক হত। শুনেছি, দেখতেও নাকি দারুণ সুন্দর লোকটা? একেবারে রাজপুত্রের মত?'

লরেলীর চকচকে উজ্জ্বল চোখ দেখে রানা বুঝতে পারল রোমান্টিক কল্পনায় নায়ক বানিয়ে বসে আছে মেয়েটা এক দুর্ধর্ষ ডাকাতকে। কল্পনায় যতটা বাড়িয়ে তুলেছে, আসলে হয়তো তার একশো ভাগের এক-ভাগও নয় সাইমন পাসেরো। হয়তো মাঝ-বয়সী টাক-পড়া গোলগাল নাদুস-নুদুস চেহারার এক লোক। দেখলেই ফাটা বেলুনের মত চুপসে যাবে মেয়েটার সব উৎসাহ।

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল হেনরী হার্স্ট, এমন সময় একজন স্টুয়ার্ড এসে কানে কানে কিছু বলল তাকে। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোটিপতির চেহারা।

'টোনারা!' প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল হার্স্ট। 'সুখবর! মাসুদ রানা, জীবনে তোলেননি এমন একটা ফিল্মের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আপনাকে যদি আমার সাথে যান। আন্ডার-ওয়াটার ক্যামেরা আছে সাথে?'

'আছে। কেন? কিসের ছবি?'

'টিউনা,' বলল হার্স্ট। চকচকে চোখে চাইল রানার মুখের দিকে। 'টানিও বলতে পারেন। প্রকাণ্ড মাছ—শয়ে শয়ে!'

'টোনারার কথা বলছেন, না?' গলা বাড়িয়ে এদিকে চাইল প্রফেসার ফেরেনসি। 'মাছ ধরার এক দারুণ মজার পদ্ধতি। খুবই পুরানো। অনেকে বলে আরবদের কাছ থেকে এসেছে এই মেথড, কিন্তু আমার ধারণা এটা আসলে ফিনিশিয়ান কৌশল। সিসিলিতে ফিনিশিয়ান ট্র্যাডিশন যতটা পাবেন, আর কোথাও এমন নয়। এই মাফিয়ার কথাই ধরুন না, অনেকে বলে এর অরিজিন আরবে, আমি বিশ্বাস করি না। কার্থেজের সিক্রেট সোসাইটির কথা শুনেছেন?—তারই বংশধর এরা। চারটে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি আমি। এক...'

'আপনি যাবেন বোঝা যাচ্ছে,' বলল হার্স্ট। 'আর কেউ?'

খুব ভোরে রওনা হতে হবে শুনেই মুচকি হেসে মাথা নাড়ল সবাই। শুধু ডক্টর জ্যাকোপো রাজি হয়ে গেল এক কথায়। মহাখুশি হয়ে চঞ্চল পায়ে ভোরে উঠে শিকারে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে হেনরী হার্স্ট।

শিকারীর উত্তেজনা দেখতে পেল রানা হার্স্টের চোখে।

কি শিকার? মাছ, না আর কিছু?

রানা জানে, যেকোন শিকার পার্টিতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোন সময়। হার্স্ট, জ্যাকোপো, দু'জনেই চলেছে শিকারে। রানাও যাচ্ছে।

ফেরেনসিও।

প্রফেসার ফেরেনসির লাশ নিয়ে ফিরতে হবে ওদের?

ছয়

হিমেল সামুদ্রিক বাতাস বইছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা ভোরের বাতাস।

কাঁপতে কাঁপতে ডেকে উঠে এল প্রফেসার ফেরেনসি। নাকের ডগাটা লাল দেখাচ্ছে। ওভারকোটেও শীত মানতে চাইছে না ওর। সারারাত চমৎকার ঘুমিয়েছে লোকটা, জানে রানা। কেউ আসেনি ওর ঘরে। কাজেই কোন কারণে হঠাৎ ভয় পেয়ে কাঁপছে, তা নয়, শীত করছে ওর।

'সোজা বিছানায় ফিরে যাও, জর্জিয়ো,' এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই হুকুম করল ডক্টর জ্যাকোপো। 'তোমার জন্যে নো ফিশিং। ডক্টরস অর্ডার!'

প্রচুর মদ গিলে একেবারে চুর হয়ে গিয়েছিল জ্যাকোপো গত রাতে, কিন্তু সেই তুলনায় খুবই তাজা লাগছে ওকে দেখতে আজ।

'আমি ঠিকই আছি,' বলল ফেরেনসি। 'একটু বেশি ঠাণ্ডা তো, তাই সামান্য কাঁপুনি হচ্ছে। ঠিক হয়ে যাবে খানিক বাদেই।'

'সোজা বিছানায় যাও। তর্ক কোরো না,' ভুরু কুঁচকে বলল জ্যাকোপো। 'শীত না, ম্যালেরিয়ার আভাস দেখতে পাচ্ছি আমি।'

অবাক হয়ে গেল প্রফেসার। 'আপনি জানলেন কি করে? এই কদিন আগে ভুগে উঠেছি। আবার অ্যাটাক হওয়া বিচিত্র নয়।'

'মদ ধরার আগে ভাল ডাক্তার ছিলাম আমি, সেকথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না। তারই ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে এখনও। যাই হোক, ম্যালেরিয়া রোগীর জন্যে খোলা নৌকো খুব একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়। লক্ষ্মীছেলের মত বিছানায় ফিরে যাও। একটা পিল দিয়ে দেব, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘুমাবে বেঘোরে।'

'আমরা' শব্দটা শুনে হাঁপ ছাড়ল রানা। তার মানে ফেরেনসির অসুখের ছুতোয় শিকারে যাওয়াটা বাতিল করছে না জ্যাকোপো। সেক্ষেত্রে রানাকেও কোন না কোন ছুতো বের করে থেকে যেতে হত ইয়টে। কারণ, কে হত্যাকারী জানা নেই যখন, ফেরেনসির কাছাকাছি থাকাই এখন রানার দরকার। একজন সম্ভাব্য হত্যাকারীর হাতে ওকে ফেলে শিকারে যেতে পারে না সে। জ্যাকোপো যদি শিকার বাতিল করত তাহলে ইয়টে থেকে যাওয়ার জন্য বিশ্বাসযোগ্য ছুতো বের করা মুশকিলই হয়ে পড়ত রানার পক্ষে।

খানিকক্ষণ বৃথা তর্ক করে নিজের কেবিনে ফিরে গেল ফেরেনসি। রানা, জ্যাকোপো ও হার্স্ট নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে স্পীডবোটে। আন্ডার ওয়াটার সুইমিং কস্টিউম আর রানার বোলেক্স ক্যামেরা তোলা হয়েছে আগেই। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে স্টার্ট দিল হার্স্ট। বসল হুইল ধরে।

আরাম করে হেলান দিয়ে বসে পাইপ ফুঁকছে জ্যাকোপো। স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে স্পীডবোট চালাচ্ছে হার্স্ট—চোখে মুখে শিকারীর উত্তেজনা।

হঠাৎ রানার মনে হলো—ওকেই শিকার করা হবে না তো!

ওর পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে?

'ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে···ওইখানে!' আঙুল তুলে দেখাল হার্স্ট।

বহুদূরে টিমটিমে আলো দেখতে পেল রানা। সকাল হয়ে এসেছে। রাত থাকতেই জাল পাতার কাজ সেরেছে জেলেরা, এখনও ব্যস্ত, আলো নিভিয়ে দেবে হাতে সময় পেলেই। হালকা কুয়াশা ভেদ করে তীরবেগে ছুটছে স্পীডবোট শিকারের পানে।

আর একটু এগিয়েই প্রকাণ্ড সব নৌকো দেখতে পেল রানা। কোন কোনটা চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট লম্বা। ছোট ছোট নৌকোও আছে অসংখ্য।

'সোজা ওইদিক থেকে আসে টিউনা,' ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছে হার্স্ট। হাত তুলে দেখাল পশ্চিম দিকে। 'বাধা পায় সামনের তীরে। তারপর গোল হয়ে তীর ঘুরে চলে যায় গভীর সাগরে। এইখানটায় জাল পাতে জেলেরা। বিরাট এক ফাঁদ। ওই যে পানিতে ভেসে আছে কর্কগুলো সরল রেখায়, দেখতে পাচ্ছেন? বিশাল জালের পুচ্ছ উঁচু করে ধরে রেখেছে ওগুলো। দেয়ালের মত। টিউনা এসে ওতে বাধা পায়। বাধা পেয়ে জালের কিনার ধরে রওনা হয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। এই জাল ঘুরে রাস্তা খোঁজে চলে যাওয়ার। এগোতে এগোতে সোজা গিয়ে ফাঁদে পড়ে মাছগুলো নিজেরই অজান্তে।'

একটা সিগারেট ধরাল হার্স্ট।

'জালের দেয়ালটা শুধু দেয়াল হিসেবেই কাজ করে। এই ফ্লোটগুলো থেকে সোজা নেমে গেছে জালটা দুশো ফিট নিচে। আসল ফাঁদটা পাতা আছে সমুদ্রের দিকে—ওই যে ওখানে। প্রকাণ্ড একটা বাক্সের মত। ওরা বলে আয়ল্যান্ড। ওটাও জালের। চওড়ায় হবে ত্রিশ গজের মত, লম্বায় একশো গজেরও ওপরে। কয়েকটা কম্পার্টমেন্ট আছে আবার। প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টের মুখেই জাল পাতা আছে, ওপরে নৌকোয় বসে একটা সুতো ধরে টান দিলেই জালটা উঠে আসবে ওপরে। খুব সহজ পদ্ধতি। জেলেরা নৌকোয় বসে চোখ রাখে। যেই একদল টানি আয়ল্যান্ডে ঢোকে, ওমনি ওটার বেরোবার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। সামনে এগোনো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না ওদের। মাছগুলো দ্বিতীয় কম্পার্টমেন্টে ঢুকলেই দ্বিতীয় দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে প্রথমটা খুলে দেয়া হয় আরও মাছের ঢোকার জন্যে। এইভাবে একটার পর একটা কম্পার্টমেন্ট পেরিয়ে শেষ ঘরে এসে হাজির হয় ওরা। ওটাকে বলে 'ক্যামেরা ডেল্লা মরটে', অর্থাৎ 'ডেথ চেম্বার, বা মৃত্যু-ঘর।'

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে হেনরী হার্স্ট। কয়েক টান দিয়েই ফেলে দিল সিগারেটটা পানিতে।

'ওই ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ জমলেই এর চারপাশ থেকে রশি ধরে

টানতে শুরু করে জেলেরা। ঘরের তলাটা উঠতে আরম্ভ করে উপরে, সেই সাথে উঠে আসে মাছ। ব্যস, ঝপাং ঝপাং কোঁচ মেরে তুলে ফেলা হয় ওগুলো নৌকোয়। আবার নামিয়ে দেয়া হয় তলাটা।'

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা এখন। শত শত লোক ব্যস্ত হয়ে আছে মাছ ধরার কাজে। তাগড়া জোয়ান, কালো চুল, উজ্জ্বল চোখ। প্রত্যেকটা বড় নৌকোয় একজন করে 'রাইস' বা নেতা—উঁচু গলায় এটা-ওটা হুকুম করছে সে। বিদ্যুৎগতিতে কাজ করছে সবাই। মহাধুম পড়েছে আজ মাছ শিকারের।

ক্যামেরা তুলে নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল রানা। রানার উৎসাহ দেখে হাসল হার্স্ট।

'সব ফিল্ম এই ফাঁকা ময়দানে নষ্ট করবেন না,' সাবধান করল সে। 'আসল ছবি তুলবেন পানির নিচে। ওপরে কি আছে? দারুণ ছবির মেটেরিয়াল পাবেন আপনি পানির তলায়।'

'আছে, আছে, ঘাবড়াবেন না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'প্রচুর ফিল্ম আছে আমার কাছে।'

কয়েকটা দারুণ শট নিল ও বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে। নীল সাগরের ঢেউয়ের উপর ভাসমান কর্কগুলোর উপর থেকে টিল্ট করে ক্যামেরা এসে থামল দাড়িওয়ালা এক বুড়ো রাইসের হাঁ করা মুখে। গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে আদেশ করছে সে, আঙুল তুলে নির্দেশ দিচ্ছে চার-পাঁচটা ছোট ছোট নৌকোর মাঝিকে। জুম করে চলে গেল রানা ব্যস্ত দুটো হাতের উপর, জাল টানছে হাত দুটো। মিডশটে দেখা গেল জেলে মাঝিদের বৈঠা বাওয়া। তারপর লঙশটে পুরো দৃশ্যটাকে এমন ভাবে ধরল যাতে মনে হয় কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে একটা। বহু দূরে মাঝিদের পিছনে দেখা যাচ্ছে মাউন্ট এটনার স্থির চুড়ো। শান্ত। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে সরু একফালি ধোঁয়া উঠছে আকাশে। রুদ্ধ হয়ে রয়েছে যেন ওখানটায় প্রলয়ঙ্কর এক প্রচণ্ড শক্তি, ফোঁস ফোঁস ছাড়ছে গন্ধক নিঃশ্বাস, কখন যে হুঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে আসবে কেউ জানে না।

আয়ল্যাণ্ডে ঢোকার মুখে প্রহরারত ছোট ছোট নৌকোর লোকগুলো হঠাৎ একসাথে চিৎকার করে উঠল। আনন্দ শিহরণ যেন ছড়িয়ে গেল সবার মধ্যে।

'ঢুকছে!' চেঁচিয়ে উঠল হার্স্ট। 'মাছ ঢুকছে প্রথম চেম্বারে! মাসুদ রানা, জলদি! তৈরি হয়ে নিন। অ্যাকুয়ালাঙ কি করে ব্যবহার করতে হয় জানা আছে তো?'

দুটো অ্যাকুয়ালাঙ সেট রয়েছে স্পীডবোটে। প্রত্যেকটায় ফিট করা আছে টুইন এয়ার সিলিণ্ডার।

ইয়ট থেকে এগুলো স্পীডবোটে তুলতে দেখেছে রানা, কিন্তু এটা দিয়ে ঠিক কি করা হবে বুঝতে পারেনি। আবছা ভাবে আন্দাজ করে নিয়েছে, পানিতে নামার প্রয়োজন হলে এগুলো ব্যবহার করার জন্যে নেয়া হচ্ছে। হার্স্টের মনের মধ্যে যে ঠিক কি আছে এখনও পুরোপুরি আন্দাজ করে উঠতে পারেনি সে। তাই বলল, 'আছে। ভালই হয়েছে এগুলো এনে। জালের

বাইরে ডুব দিয়ে মাছগুলোর ডেথ চেম্বারে ঢোকার ছবি তোলা যাবে।'

'বাইরে থেকে!' ভ্রূ কুঁচকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চাইল হার্স্ট রানার চোখের দিকে। 'বাইরে থেকে কেন? ভেতরে চলুন। আমি যাচ্ছি।'

হার্স্টের বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে পারল না রানা। কি বলছে লোকটা?

'জালের ভেতরে নামব আমরা,' আর একটু পরিষ্কার করে বলল হার্স্ট। 'টিউনা হচ্ছে সমুদ্রের দ্রুততম মাছ। এবং বিপজ্জনক। বড়শিতে এক-আধটা গেঁথেছি আমি আগে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন স্কিন-ডাইভার মারতে পারেনি একটাকেও। কারও কোন রেকর্ড নেই। সহজ কারণ—ওর কাছেই পৌঁছনো যায় না। এত তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটে! এবার ব্যাটারা যাবে কোথায়? পালাবার উপায় নেই। পানির নিচে টানি ঘায়েল করে রেকর্ড সৃষ্টি করব আমি।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল হার্স্ট। চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে রানার চোখে।

'ইচ্ছে করলে এই ঘটনাটার ছবি তুলে আপনিও রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেন। চলুন, যদি সাহস থাকে।'

হার্স্টের চোখে চ্যালেঞ্জ দেখতে পেল রানা।

এটা কি সেই শুটিঙের পরবর্তী ম্যাচ? আর এক বাউট খেলতে চায় হার্স্ট রানার সাথে?

নাকি ওর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে লোকটা? রানার আসল পরিচয় বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ ঘটেছে? কোন একটা লিকেজের সুযোগে ওর পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে?

'মাথা খারাপ তোমার, হেনরী!' প্রথম কথা বলল ডক্টর জ্যাকোপো। 'মারা পড়তে পারো তোমরা ওর মধ্যে! জালের ভেতর এতগুলো টিউনা—সর্বনাশ! যা-তা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া এক-আধটা হাঙরও ঢুকে পড়তে পারে ওগুলোর সাথে সাথে, সে খেয়াল আছে?'

'হাঙর মারার অভ্যাস আছে আমার, তুমি জানো, ডাক্তার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হার্স্ট।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথা নাড়ল জ্যাকোপো এপাশ ওপাশ।

'মারা পড়বে! সিম্পলি মারা পড়বে!'

'যেকোন সময়, যেকোন জায়গায় ঘটতে পারে মৃত্যু। মরণকে ভয় পাওয়া পুরুষ মানুষের সাজে না।'

কাপড় ছেড়ে পায়ে ফ্লিপার বেঁধে ফেলেছে হার্স্ট, অ্যাকুয়ালাঙটা হাতে তুলে নিয়েছে এখন। 'পুরুষ' শব্দটার উপর একটু জোর দিল সে। লালচে আভা দেখা দিল জ্যাকোপোর গালে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাপড় ছাড়তে শুরু করল রানা। পিছিয়ে যাওয়া চলে না। যা থাকে কপালে, এগোতেই হবে এখন। বলল, 'আপনার কাছে যদি এটাকে বোকামি মনে না হয়, মিস্টার হার্স্ট, যদি জালের ভেতরেই নামতে চান, আমিও আছি আপনার সাথে।'

'মাথা খারাপ!' বিড়বিড় করে বলল জ্যাকোপো। 'দুটোরই মাথা খারাপ। মরুক ব্যাটারা, আমার কি? তবে দয়া করে আধ-মরা হয়ে ফিরে এসে আমার কাজ বাড়িয়ো না।'

আয়েস করে বসে পাইপ ধরাল ডাক্তার। যেন ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখছে, এমনি হাসি হাসি মুখ করে দেখছে ওদের ফ্লিপার বাঁধা, অ্যাকুয়ালাঙ কাঁধে ঝুলানো, ভালভ্ অ্যাডজাস্ট করা।

হার্স্ট ডুব দেয়ার দশ সেকেন্ড পরে ডুব দিল রানা। কারণ কোটিপতির হাতে রয়েছে একটা গ্যাসচালিত হার্পুন গান। রানা নিরস্ত্র। ওর হাতে রয়েছে আন্ডার-ওয়াটার সিনে ক্যামেরা। ওয়াটারপ্রুফ কেসে পোরা, বাইরে থেকে সবকিছু কন্ট্রোলের ব্যবস্থা, ভিতরে পানি ঢুকবার উপায় নেই।

সিনে ক্যামেরা দিয়ে হার্পুন ঠেকানো মুশকিল। মাছ ধরতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যদি ভুল করে ক্যামেরাম্যান অতিথির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে ফেলে হার্পুনের তীর তাহলে খুব বেশি জবাবদিহি করতে হবে না হার্স্টকে। শিকারে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নেমে যাচ্ছে ওরা। বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে রানা। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, যে মুহূর্তে হার্পুন গানটা ওর দিকে ফিরবে, ওমনি উপর দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করবে সে। পানির নিচে এই বন্দুকের এফেকটিভ রেঞ্জ সাত-আট ফুটের বেশি নয়। ঠিক এই দূরত্বই বজায় রেখেছে রানা দু'জনের মধ্যে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা।

এগিয়ে যাচ্ছে ডেথ চেম্বারের দিকে।

অস্পষ্ট একটা সোঁ সোঁ আওয়াজে চমকে উঠল রানা। পাইপের গায়ের ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। পাইপটা যেখানে এসে মাউথপিসের সাথে মিশেছে, সেইখানে।

এইভাবেই? এই কৌশলেই ওকে শেষ করে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে মাছের ফাঁদে? অ্যাকুয়ালাঙের মধ্যেই কায়দা করে রেখেছে কেউ?

বুড়ো আঙুলটা ঠেসে ধরল রানা ফুটোর উপর। বন্ধ হয়ে গেল লিকেজ। এখনি কি ভেসে উঠবে সে উপরে? আরও কোথাও লিক আছে কিনা দেখল সে ঘাড় কাত করে। না। আর কোথাও কোন লিক নেই। থাকলে বুদ্বুদ দেখা যেত।

পাইপের ভিতর পানি ঢুকছে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা। বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে বলে ভিতরে ঢুকতে পারছে না পানি। কাজেই খুব একটা ভয়ের কিছুই নেই আপাতত। সর্টসের পকেট থেকে একটা সরু রশি বের করে একফুট আন্দাজ ছিঁড়ে ফেলল ও। তারপর সেটা দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল ফুটো হয়ে যাওয়া জায়গাটা। টিপ টিপ করে এক এক ফোঁটা করে বেরোচ্ছে এখন বাতাস। বেরোক, ক্ষতি নেই তাতে। বাঁধনের ফলে আর বাড়তে পারবে না ফুটোটা।

বেশ কিছুটা দূরে থেমে দাঁড়িয়ে জলদি এগোবার জন্যে ইঙ্গিত করছে হার্স্ট। আবার এগোল রানা। কাঁধ থেকে খুলে ক্যামেরাটা হাতে নিল। যদি

হার্পুন চালাবার উপক্রম করে তাহলে আগে অন্তত এক সেকেন্ড ছবি তুলে নেবে সে, তারপর ভাগবে জান-প্রাণ নিয়ে।

একদল ফ্লাইং ফিশ বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে এইদিকে। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটাচ্ছে ওগুলো। নিশ্চয়ই ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছে টিউনা। সামনে দুই সাঁতারুকে দেখে আরও ভয় পেল উড়ো মাছগুলো। বাঁকা হয়ে উঠে যাচ্ছে ওরা এখন উপরে। এত জোরে ডানা ঝাপটাচ্ছে যে জোরে ফ্যান ঘুরলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাচ্ছে ওদের পাখাগুলো। সাঁ করে চলে গেল ওরা উপরে, কয়েক সেকেন্ড পরই বৃষ্টির ফোঁটার মত অনেকগুলো আলোর বিন্দু দেখা গেল মাথার উপর। পানি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল উড়ো-মাছগুলো।

এবার এল এক ঝাঁক ম্যাকারেল। উজ্জ্বল নীল আর রূপালী রঙের ঝিলিক খেলে গেল রানার চারপাশে। সাগরের তলায় পৌঁছে গেল রানা হার্স্টের দশ ফুট পিছনে। একটা বড়সড় মসৃণ পাথরের ওপাশে কুঁজো হয়ে হার্পুন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হার্স্ট। চেয়ে রয়েছে উপর দিকে। ওর দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল রানা, ওর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে এখন হার্স্টের মন থেকে। শিকার খুঁজছে শিকারী। স্পষ্ট উপলব্ধি করল রানা, এই মুহূর্তে অন্তত শিকারীর লক্ষ্য সে নয়। কয়েক ফুট ফিল্ম এক্সপোজ করল সে হার্স্টের উপর।

এইবার এল টিউনার দল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল রানা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। প্রকাণ্ড! যেমন দেখতে তেমনি রাজকীয় চলার ভঙ্গি, তেমনি তার শক্তির বিচ্ছুরণ। দুই কথায়, সুন্দর এবং দুর্বার। বিশাল দুই চোখ চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। আবেগবর্জিত, পলকহীন দৃষ্টি। ধীর স্থির সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে এল ওরা, ঝুলন্ত জালে বাধা পেল, জালের কিনার ধরে চলল সার বেঁধে। মাঝে মাঝে নাক ঠেকিয়ে দেখছে এখনও বাধাটা আছে কিনা। শত সহস্র বছর ধরে এইভাবেই চলেছে ওরা প্রবৃত্তির তাড়নায়। আরও শত সহস্র বছর চলবে এইভাবেই।

আরও কাছে চলে এল প্রকাণ্ড মাছগুলো। ঝকঝকে রূপালী গা। কয়েক গজ দূরে সড়সড় করে উপরে উঠে গেল একটা জাল। ভিতরে চলে এসেছে টিউনা, বেরিয়ে যাওয়ার আর উপায় নেই।

ছবি তুলতে শুরু করল রানা। ধীরে ধীরে ক্যামেরাসহ চিৎ হয়ে গেল সে। মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে প্রকাণ্ড মাছগুলো। উপরে উজ্জ্বল রোদের আলো থাকায় সিলুয়েটে আসবে ছবিটা। দারুণ নাটকীয় ছবি হবে, বুঝতে পারল ও ছবি তুলবার সময়ই।

হঠাৎ ভিউ ফাইন্ডারে দেখতে পেল সে হার্স্টকে। বিশাল আকৃতিগুলোর পাশে ক্ষুদ্র, দুর্বল মনে হলো ওকে রানার। চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করল ওকে। বলতে ইচ্ছে করল, ফিরে আসুন, আপনার ক্ষমতায় কুলোবে না। এদের সাথে লাগতে যাবেন না অনর্থক।

এই কম্পার্টমেন্টে দশ বারোটা টিউনার সাথে ঢুকে পড়েছে একটা দশ

ফুটি সোর্ডফিশ। পাগলের মত এদিক-ওদিক বেরোবার রাস্তা খুঁজছে ওটা।

শিরশির করে উঠল রানার মেরুদণ্ডের ভিতর। যেকোন মুহূর্তে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে ওকে মাছটা তীক্ষ্ণ, লম্বা ঠোঁট দিয়ে। ভয়ঙ্কর মাছটাকে হার্স্টের দিকে ফিরতে দেখেই আঁৎকে উঠল রানা, খরচের খাতায় লিখে ফেলল হার্স্টের নাম। কিন্তু না। মাছটা হয়তো মনে করল ওরই মত ফাঁদে আটকা পড়েছে শিকারীটাও, অন্যদিকে এগোল ওটা বেরোবার পথ খুঁজতে।

আপাতত বাঁচা গেলেও বিপদ কিন্তু রয়েই গেল, বুঝতে পারল রানা। সরাসরি আক্রমণের ভয় কম। আক্রমণ যদি করে বসেও ঠোঁট দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করবার অভ্যাস নেই ওদের। ওটাকে ডাণ্ডা হিসেবে ব্যবহার করে ওরা, বাড়ি দিয়ে কাহিল করে ফেলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছকে, তারপর গিলে খায়। কিন্তু বেরোবার পথ না পেয়ে যদি ভড়কে যায় ব্যাটা, তাহলেই সর্বনাশ। চোখ কান বুজে তিরিশ মাইল বেগে ছুটতে আরম্ভ করবে ওটা এইটুকু জায়গার মধ্যে—যে সামনে পড়বে সে-ই খতম।

এগারো ফুট লম্বা একটা টিউনাকে বেছে নিয়েছে হার্স্ট। এগিয়ে যাচ্ছে দৈত্যটার দিকে। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না মাছটা হার্স্টকে। পাত্তা দেয়ার কথাও নয়। ওর পাশে হার্স্টকে লাগছে পুঁচকে এক বাঁদরের মত। ক্যামেরার বোতাম টিপে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। হার্পুনটা তাক করছে হার্স্ট এখন।

'ফট' করে গ্যাস-গানের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল রানা। পরমুহূর্তে নারকীয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেল পানির নিচে।

ঠিক মাথা সই করে মেরেছিল হার্স্ট, কিন্তু জায়গা মত না পড়ায় হাড়ে লেগে ফসকে গিয়ে বিঁধল ওটা কাঁধের শক্তিশালী পেশীতে।

ব্যথা কাকে বলে জানা ছিল না মাছটার। জীবনে চোট খায়নি কোন দিন। তীরটা বিঁধে যেতেই মাথা খারাপ হয়ে গেল ওটার। যন্ত্রণা কাকে বলে বুঝে গেছে সে এখন, এবং খুবই অপছন্দ হয়েছে ব্যাপারটা ওর।

প্রকাণ্ড লেজে তিনটে প্রচণ্ড ঝাপটা দিল মাছটা, ছুটল সামনের দিকে। সড়সড় করে হার্পুনের সুতো ছাড়ছে হার্স্ট, মাঝে মাঝে টেনে ধরে থামাবার চেষ্টা করেছে দৈত্যটাকে।

কিসের কি! হ্যাঁচকা টানে নিজেই চলেছে সে মাছটার পিছু পিছু।

ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে, টের পেল রানা। ক্যামেরা চালু রেখেই পা বাড়াল সে সামনের দিকে—প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে।

এতক্ষণ এত একাগ্র মনোযোগের সাথে শিকার দেখছিল আর ছবি তুলছিল রানা, যে নিজের পারিপার্শিকতার দিকে লক্ষ দেয়া সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। এক পা বাড়িয়েই থেমে গেল সে।

নড়াতে পারছে না দ্বিতীয় পা-টা।

পায়ের কব্জির কাছে কি যেন জড়িয়ে ধরে আছে শক্ত করে।

ঝট করে পিছন ফিরে নিচের দিকে চাইল রানা। মস্ত বড় একটা পাথরের নিচ থেকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে একজোড়া চোখ। চোখের

পাশ থেকে একটা রবারের শুঁড় বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে আছে ওর পায়ের কব্জি।

অক্টোপাস!

সাত

জ্ঞান উড়ে গেল রানার।

একটা শুঁড়ের আয়তন দেখেই বুঝে গেছে সে, পাকা খচ্চরের হাতে পড়েছে সে এবার। আরও জোরে চেপে বসেছে ওটা কব্জির উপর। খসখসে স্পর্শে শিউরে উঠল শরীরটা।

ঝপ করে বসে পড়ে একহাতে টেনে ওটাকে পা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা, ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে দুহাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

'ভয়ের কিছুই নেই,' নিজেকে নিজেই সাহস দিল রানা। কিন্তু এসব কথায় চিঁড়ে ভিজল না। পায়ের কব্জিতে জোরে একটা টান পড়তেই হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল পিঞ্জর ছেড়ে। বহু কষ্টে নিজেকে স্থির রাখল সে। পাথরের নিচে ঠিক কিভাবে বসে আছে জন্তুটা বোঝার চেষ্টা করল। ওটাকে একবার টেনে বের করে আনতে পারলে আর কোন ভয় ছিল না। কিন্তু কিছুতেই বেরোতে চাইবে না ব্যাটা ফাঁক গলে, জানা আছে রানার। ওখানেই গ্যাট হয়ে বসে থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে ও এখন।

ডান পা-টা পাথরের গায়ে বাধিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলা দিল রানা। শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল পিছন দিকে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে টানল সে কয়েক সেকেন্ড। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল মুখোশের ভিতর ওর কপালে। কিন্তু একচুল নড়ল না অক্টোপাস।

অক্টোপাসের চোদ্দগুষ্টি, বিশেষ করে বাপ-মা তুলে গাল দিয়ে ওটাকে কিছুটা দুর্বল করে নিয়ে আবার হ্যাঁচকা টান দিল রানা। চট করে আরেকটা শুঁড় বেরিয়ে এসে পেঁচিয়ে ধরল রানার হাঁটু। বেতমিজ, বেঈমান, হারামখোর—এবার সরাসরি ওকেই গাল শুরু করল রানা—লুকিয়ে থাক! ঘরের ভেতরে বসে বাহাদুরি! বেরিয়ে এসো না, চাঁদ, দেখি কতবড় সাহস? উল্লুকের মত তাকিয়ে রয়েছিস কেন? ইস্টুপিড কোথাকার, আয় না বেরিয়ে দেখি?

হার্স্ট ব্যাটাই বা গেল কোথায়? ও ফিরে এলে হার্পুনের এক খোঁচায় খতম করে দেয়া যেত হারামি জানোয়ারটাকে। আশপাশে চেয়ে কাছে পিঠে কোথাও দেখতে পেল না রানা হার্স্টকে। নিরুপায় সে এখন।

হঠাৎ ওর মনে হলো, জুডোর কৌশল প্রয়োগ করে দেখলে কেমন হয়? এ ব্যাটা নিশ্চয়ই জুডো জানে না। এর উপর চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না

কিন্তু।

জুডোর মূল কথা, প্রতিপক্ষের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে তাকে বেকায়দায় ফেলা। আর ভারসাম্য নষ্ট করবার শ্রেষ্ঠ কৌশল, প্রতিপক্ষের নিজের শক্তিকে তার নিজেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। কাউকে হাত ধরে সামনে টানতে চাইলে নিজের অজান্তেই সে লোক পিছনে টানবে, ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করলে সে-ও ধাক্কা দেবে। অর্থাৎ যা-ই করা হোক না কেন, প্রতিপক্ষ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে উল্টোটা দিয়ে।

হঠাৎ জোরে সামনের দিকে চাপ দিল রানা। সত্যিই, অক্টোপাসটা ঠেলে দূরে রাখার চেষ্টা করছে ওকে! এইবার আচমকা পিছনে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই হুড়ুশ করে অর্ধেকটা শরীর বেরিয়ে এল ওটার গর্তের বাইরে। জাপানী কায়দা দেখে ভড়কে গেল জন্তুটা। কি করবে বুঝতে পারছে না। আরও একটা শুঁড় বের করে আনছিল, কি মনে করে ফিরিয়ে নিল সেটা।

কিন্তু এখন ওর মাথাটা বেশ খানিকটা কাছে চলে এসেছে। আর কোন ভয় নেই। সামনে ঝুঁকে বাম হাতের তর্জনীটা ঢুকিয়ে দিল রানা ভয়ঙ্কর জন্তুটার চোখে।

সারা শরীর কেঁপে উঠল একবার অক্টোপাসের। খোঁচা খেয়ে চমকে গিয়েছে ওটার অন্তরাত্মা। একটা খিঁচুনি দিয়েই হাল ছেড়ে দিল।

পাথরটায় ডান পা বাধিয়ে চাপ রেখেছিল রানা। জন্তুটা হঠাৎ হাল ছেড়ে গা ঢিল করে দিতেই পায়ের ধাক্কায় দ্রুতবেগে উপরে উঠতে শুরু করল ওর শরীরটা।

রানার পা জড়িয়ে ধরে ঝুলে আছে অক্টোপাসটা। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল ওটার। গায়ের রঙ পরিবর্তন করল আতঙ্কে। এই একটু আগে ছিল কালচে পাথুরে রঙ, মুহূর্তে নীল হয়ে গেল। সাগরের নীলের সাথে রঙ মিলিয়ে নিয়ে শিকারী মাছদের বোঝাবার চেষ্টা করল ও আসলে কিছু না—পানি।

হঠাৎ রানার ডান পাশটা দুলে উঠল। ঝকঝকে রূপালী একটা শরীর দেখতে পেল সে এক মুহূর্তের জন্যে, পরমুহূর্তে পা আগে মাথা পিছনে, এমনি অবস্থায় প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করল ওর শরীরটা পানির মধ্যে দিয়ে।

রঙ বদলাবার আগেই দেখে ফেলেছিল অক্টোপাসটাকে একটা বিশাল টিউনা। কচ্ করে কামড়ে ধরেই ছুটতে শুরু করেছে ওটা পাছে আর কেউ ভাগ বসাতে চায়। এদিকে মরতে বসেছে, কিন্তু রানার পা ছাড়ছে না শয়তানটা, তেমনি এঁটে ধরে রেখেছে পায়ের কব্জি। ফলে রানাও ছুটছে টিউনার সাথে সমান বেগে।

তিনপাশ আটকানো জায়গাটুকুর মধ্যে প্রাণপণে ছুটছে টিউনা, ওর গরম গায়ের সাথে ঘষা খাচ্ছে রানার শরীর, ছড়ে যাচ্ছে খড়খড়ে আঁশের আঁচড় লেগে। আর প্রতিবার দিক পরিবর্তনের সময় বিশাল লেজের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে দুই মিনিটের মধ্যে রানাকেও কাহিল করে আনল দানবটা।

পানির তোড়ে খসে গেল রানার মাস্ক, মাউথপিস।

আর এক মিনিট টিকতে পারবে সে এইভাবে। বড়জোর দুই মিনিট।

এক মিনিটের মধ্যেই সাহায্য এসে গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে।

আর সব টিউনা ঘোড়ার ঘাস কাটে না। পানিতে সুস্বাদু অক্টোপাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে তাদেরই একজন পাগল হয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। আসল ব্যাপারটা কি বুঝে নিতে দেরি হলো না ওদের।

এক ডজন দৈত্য ঝাঁপিয়ে পড়ল চারপাশ থেকে। শুরু হয়ে গেল প্রলয়কাণ্ড। যে যেদিক থেকে পারল অক্টোপাসের কোন না কোন অংশ কামড়ে ধরে শুরু করে দিল ধস্তাধস্তি। প্রথম যে অক্টোপাসটাকে ধরেছিল সে চেষ্টা করছে কোনমতে কোঁৎ করে জিনিসটাকে গিলে ফেলতে, কিন্তু টানা-হেঁচড়ায় সম্ভব হচ্ছে না সেটা।

উপর্যুপরি লেজের ঝাপটায় সব বাতাস বেরিয়ে গেল রানার ফুসফুস থেকে। দুই ঢোক নোনা পানি গিলে ফেলল সে দু'পাশ থেকে দুটো বিশাল শরীরের চাপ খেয়ে।

আধ মিনিট পর প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় অনুভব করল রানা, আলগা হয়ে যাচ্ছে ওর পায়ের বাঁধন। ততক্ষণে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা হয়েছে অক্টোপাসকে। মুক্ত এখন সে। কিন্তু উপরে ওঠার সাধ্য নেই।

ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সে নিচে। হঠাৎ সচকিত হয়ে চোখ মেলল রানা। দেখল ক্যামেরাটা কখন খসে গেছে কাঁধ থেকে খেয়ালই করেনি সে। অক্টোপাসের কোন অংশ মনে করে স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে এক পায়ের ফ্লিপার টেনে নিয়ে চলে গেছে যেন কোন্ বোকা। কিছুক্ষণ আগের হুলস্থুলের কোন চিহ্নও নেই আর। শান্ত ভঙ্গিতে ধীরে সুস্থে জালের গায়ে নাক ঠেকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা এখন ডেথ চেম্বারের দিকে।

দুর্বল ভাবে চেষ্টা করল রানা উপরে ওঠার। বুঝতে পারল, কোনদিন উপরে পৌঁছতে পারবে না সে। হাত-পা আর মানছে না মস্তিষ্কের আদেশ। ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু।

ইচ্ছে উপরে ওঠার, কিন্তু নেমে যাচ্ছে সে নিচে।

'কি নাম?'

'মাসুদ রানা।'

'কি করা হয়?'

'আমি একজন ইজিপশিয়ান ক্যামেরাম্যান,' বলল রানা। 'শর্ট ফিল্ম তৈরি করে বিক্রি করি পৃথিবীর বড় বড় টেলিভিশন কোম্পানির কাছে। ফ্রীল্যান্স ক্যামেরাম্যান, মানে...'

কলপ লাগানো কুচকুচে কালো আধ-হাত লম্বা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিল আর স্বর্গীয় হাসি হাসছিল লোকটা, হঠাৎ ওর ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখেই থেমে গেল রানা। ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা।

'এখনও মিছে কথা? ছি ছি ছি ছি ছি! জীবনে যত অন্যায় করেছ তার জবাবদিহি করতে হবে, ছোকরা, তোমার এখানে। কিন্তু এখানেও যদি মিছে কথা বলো তাহলে তো আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমি। যাক, তোমার পরিচয় জানা আছে আমাদের, এখন বলো, দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকেছিলে কেন?'

দুপাশ থেকে দু'জন গার্ড শক্ত করে ধরে আছে রানার দুই হাত। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

'হুম! কোন জবাব নেই, তাই না?' হাসি ফুটে উঠল আবার প্রশ্নকর্তার মুখে। 'শোনো হে ছোকরা, স্পাইগিরি এখানে চলে না। বুঝলে? এটা তোমার পৃথিবী নয় যে যা খুশি তাই করবে অথচ আর কেউ টের পাবে না। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ বড়ই ভয়ঙ্কর। নরকের কয়েদখানায় আটকে রাখা হয়েছিল তোমাকে. তুমি সেফটিপিন দিয়ে খুঁচিয়ে তালা খুলেছ, আশ্চর্য কৌশলে সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে এসেছ ফাটক থেকে, তারপর ছদ্মবেশে দেয়াল টপকে ইডেন গার্ডেনে ঢুকে সবার সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলে। তাড়া করে ধরতে যাওয়ায় জুডো মেরে তিনজন গার্ডকে ধরাশায়ী করেছ, একজনকে এমন এক কারাতের কোপ মেরেছ যে তার অবস্থা এখন কি তখন। আরও অভিযোগ আছে। একজন মহা পরহেজগার লোকের বোতল থেকে সবটুকু শরাব খেয়ে ফেলেছ তুমি। তার বিবির সাথেও নাকি ভাব জমিয়ে ফেলেছিলে প্রায়। কেঁদে দাড়ি ভাসাচ্ছে সে এখন। ছি ছি, মাসুদ রানা, তোমার এই ব্যবহার বড়ই দুঃখজনক। কঠোর শাস্তি পেতে হবে তোমাকে এজন্যে। প্রহরী!'

'জ্বি, হুজুর!'

প্রহরীদের দিকে ফিরল লোকটা। হাত তুলে পূবদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

'নিয়ে যাও একে, সাতদিন ফেলে রাখো অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। সেই সাথে দুজন দুদিক থেকে দুরমুজ চালাতে থাকো ওর পিঠের ওপর। যাও।'

অসহ্য গরম। তার উপর হুমহাম শব্দ হচ্ছে আর ধুপধাপ দুরমুজ পড়ছে পিঠের উপর। গরম ততটা না, দুরমুজটাতেই কষ্ট হচ্ছে বেশি।

'উহ্!' বলে পাশ ফিরল রানা।

সাথে সাথেই কানে গেল হেনরী হার্স্টের কণ্ঠস্বর।

'হয়েছে, হয়েছে, জ্যাকোপো। থামো এখন। জ্ঞান ফিরছে বলে মনে হচ্ছে।'

চোখ মেলল রানা।

এতক্ষণ আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন দেয়া হয়েছিল ওকে। প্রকাণ্ড এক নৌকোর পাটাতনের উপর কড়া রোদের মধ্যে শুয়ে আছে রানা উপুড় হয়ে, ওর শরীরের দুই পাশে দুই হাঁটু গেড়ে বসে শ্বাস চালু করবার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ ডক্টর জ্যাকোপো, রানাকে নড়ে উঠতে দেখে সরে গেল একপাশে। ভুরভুর করে মাছের আঁশটে গন্ধ আসছে পাটাতনের নিচ থেকে। দড়াম করে

আরেকটা মাছ পড়ল ঢাকনি খোলা জায়গায়। এঁকেবেঁকে ছটফট করছে ওটা মৃত্যু যন্ত্রণায়।

চিৎ হয়ে শুয়ে চারপাশে চাইল রানা। মাথার কাছে বিশাল এক পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে হার্স্ট। দাঁতে পাইপ চেপে অনাবিল আনন্দে হাসছে জ্যাকোপো।

'কেমন বোধ করছেন?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। 'অবশ্য ভাল বোধ করবারই কথা। ভূমধ্যসাগরের অর্ধেক পানি বেরিয়েছে আপনার পেট থেকে। উঠে বসুন, আর কোন ভয় নেই।'

উঠে বসল রানা।

'আমার ক্যামেরা?' প্রশ্ন করল রানা প্রথমেই। 'ওটা তোলা হয়েছে?'

বুড়ো আঙুল দিয়ে একপাশে রাখা ওয়াটার-প্রুফ মোড়া ক্যামেরাটা দেখাল ডাক্তার।

'ক্যামেরা ও তার ম্যান—দু'জনকেই নিরাপদে তুলে এনেছে হেনরী।'

'ধন্যবাদ,' কোটিপতির দিকে ফিরল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

'ও কিছুই নয়,' কোটিপতি বলল। 'গ্ল্যাড টু হেলপ।'

বেলা দশটা। চারদিকে চড়চড়ে রোদ।

তীরবেগে ছুটে চলেছে স্পীড বোট। ফিরে যাচ্ছে ওরা ইয়টে।

চোখ বুজে সিগারেট টানছে রানা একটার পর একটা। আর ভাবছে। ওর উপর কেমন যেন একটা অধিকারের ভাব এসে গেছে হার্স্টের। কারও প্রাণ বাঁচালে নিজের অজান্তেই এসে যায় ভাবটা সবার মধ্যে। এটা খারাপ কিছু নয়। মনের সুখে গুনগুন গান গাইছে লোকটা এখন, মাঝে মাঝে হাসছে রানার দিকে চেয়ে। সকালটা খুব উপভোগ করেছে ব্যাটা বোঝা যাচ্ছে।

ডাক্তারও খোশ মেজাজে আছে। পাইপ থেকে ধোঁয়া আর ফ্লাস্ক থেকে হুইস্কি টানছে সমানে। একবার বিরাট একটা স্যামন ধরেছিল, সে গল্প শোনাচ্ছে বাতাসকে। ভাবটা, কারও ইচ্ছে হলে শুনতে পারো, আমার বলার আমি বলে যাচ্ছি।

রানা পড়েছে অদ্ভুত এক সমস্যায়। হেনরী হার্স্ট ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কৃতিত্বের বেশ কিছুটা দাবিদার ডক্টর জ্যাকোপোও। এরা দু'জন মিলে বাঁচিয়েছে ওকে। তার মানে কি এরা হত্যাকারী নয়? নাকি তার মানে এরা এখনও জানে না রানার আসল পরিচয়, পরের কথাটাই সত্যি যতদূর সম্ভব। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী এদের দু'জনের মধ্যে যে কোন একজন অবশ্যই হত্যাকারী।

তাহলে?

আজকের ঘটনা দিয়ে এদের বিচার করবার কোন মানে হয় না। ওকে যখন স্পাই হিসেবে সন্দেহ করা হয়নি তখন পানির নিচ থেকে তুলে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করাই এদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তবু কথা একটা থেকেই যাচ্ছে অস্বীকার করতে পারল না রানা: ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে আজ হত্যাকারী।

যখন সময় আসবে, কি করে হত্যা করবে ও তাকে?

আট

'তীরে গেছে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হার্স্ট। 'তীরে গেছে মানে?'

রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো জ্যাক ডেল অবাক হয়ে গেল হার্স্টের হঠাৎ খেপে ওঠা দেখে।

'কেন? তীরে না যাওয়ার কি আছে, হেনরী? প্রফেসার গেল তোমাকে দেখাবার জন্যে কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসতে, লরেলীও সাথে গেল গুহাগুলো আর একবার ঘুরে ফিরে দেখে আসবে বলে। বেহুদা চেতে উঠছ কেন? তোমার গরিলাটা, কি নাম যেন…রাটল্যান্ড, গেছে সাথে।'

অ্যাকুয়ালাঙের এয়ার পাইপটা চট করে পরীক্ষা করে নিল রানা ইয়টে তুলে ফেলবার আগেই। পরিষ্কার বোঝা গেল কেউ ওকে খুন করবার জন্যে ফুটো করেনি পাইপটা, ওটা আপনিই তৈরি হয়েছে পুরানো পাইপের গায়ে। বেশ অনেকটা হালকা হয়ে গেল ওর মন।

'ওই অপদার্থটার ওপর কোন আস্থা নেই আমার!' বলল হার্স্ট কড়া গলায়। 'ওদের যেতে না দিলেই ভাল করতে।'

'আমি রুখতে পারব তোমার মেয়েকে!' চোখ কপালে তুলল ডেল। 'বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, তুমি নিজে এখানে উপস্থিত থাকলে ঠেকাতে পারতে কিনা? মাথায় কোন খেয়াল চাপলেই হলো ওকে ঠেকবার সাধ্য আছে কার?'

রানা লক্ষ করল ডেকের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে আছে অন্যান্য অতিথিরা। হার্স্টের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। কেউ সামান্য একটু নড়ল না পর্যন্ত। এটা কি ভদ্রতা? ঔদাস্য ? অপেক্ষা? সাবধানতা? না ভয়?

একমাত্র জ্যাকোপো ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করল হার্স্টকে।

'কেন খামোকা মাথা গরম করছ, হেনরী? তীরে গেছে তো কি হয়েছে! তুমি তো আর বারণ করে যাওনি?'

ঝট করে ডাক্তারের দিকে ফিরল কোটিপতি।

'দ্যাখো, জ্যাকোপো, তোমার পরামর্শের দরকার আছে মনে করলে আমি চাইব,' কথাটা কড়া গলায় বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল হার্স্ট। নরম গলায় বলল, 'আমার মত যদি শিকার করতে, যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও দিনের পর দিন বিপদের মধ্যে কাটাবার অভ্যাস থাকত, তাহলে আমার মতই সহজে টের পেতে কোন্‌টা আসল বিপদ আর কোন্‌টা কাল্পনিক আতঙ্ক। আস্থা রাখতে পারতে নিজের ইসটিংক্টের ওপর। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কোথাও

কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ভয়ানক কোন বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

হেসে ফেলল ডাক্তার।

'সেক্ষেত্রে আমার করবার কিছুই নেই। ইন্সটিংক্টের অসুখ সারাবার কোন ওষুধ নেই আমার কাছে।'

কড়া দৃষ্টিতে ডাক্তারকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল হার্স্ট. বিফল হয়ে ঝট করে ঘাড় ফিরাল অন্যদিকে। ডেকের একপাশে বার খাড়া করা হয়েছে একটা। এগিয়ে গিয়ে হুইস্কি ঢালতে শুরু করল ডাক্তার।

খাঁচায় পোরা বাঘের মত পায়চারি শুরু করল হেনরী হার্স্ট। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, মিনিটে মিনিটে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। স্পষ্ট উদ্বেগের রেখা দেখতে পেল রানা ওর গালে, কপালে। অবাক হলো ও। এই লোকটাকে খুনী হিসেবে কল্পনা করা সত্যিই কঠিন।

যাকগে! একটা ছায়া বেছে নিয়ে বসে পড়ল রানা। ব্যক্তিগতভাবে ওর উদ্বেগের কিছুই নেই। হত্যাকারী এখন ইয়টে, তার শিকার গেছে ডাঙায়। কাজেই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে সে এখন।

গগল্স্ আঁটা সুন্দরীকে দেখতে পেল রানা। দু'হাতে দুটো শ্যাম্পেনের গ্লাস আর ঠোঁটের কোণে দুর্বোধ্য হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। মুচকে হাসল ও—কোন পরহেজগারের বিবি নয়তো!

ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে নৌকোটা। স্থানীয় ধাঁচে তৈরি শক্ত পোক্ত ছইহীন নৌকো। গলুইয়ে বসে বৈঠা বাইছে ছেঁড়া শার্ট গায়ে এক ইটালিয়ান ছোকরা। পনেরো ষোলো বছর বয়স হবে। আর একটু কাছে আসতেই হাঁক ছাড়ল ইয়টের এক খালাসী।

'অ্যাই ছোকরা। দূর হাটো!'

উত্তরে একটা খাম নেড়ে দেখাল ছোকরা। কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'চিঠি। সিনরের জন্যে চিঠি।'

চিঠি হাতে উঠে এল ছোকরা। ছিপছিপে লম্বা, বাদামী রঙা সাহসী চোখ, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুল। রঙ ওঠা ছেঁড়া জামাটা ঘামে ভিজে সপসপ করছে।

কঠোর হার্স্টের মুখ। খামটা নিল ছোকরার হাত থেকে। রানা চেয়ে দেখল খাম খুলে একটা চিঠি বের করল হার্স্ট, সেই সাথে পিন দিয়ে আঁটা লাল কি যেন। লরেলীর জামার মত লাল।

গম্ভীর ভাবে চিঠিটা পড়ল হার্স্ট। মুখের চেহারা বিকারহীন, ভাবাবেগবর্জিত।

চিঠিটা শেষ করেই দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল সে ছোকরার মুখে। ঠোঁট কেটে দর দর করে রক্ত বেরিয়ে এল। হুড়মুড় করে পড়ল সে ডেকের উপর। পড়েই হাঁটু দুটো ভাঁজ করে ঢেকে ফেলল তলপেট। কারণ, ও জানে ঘুসির পরেই আসবে লাথি।

কিন্তু লাথি না মেরে আবার চিঠিটা পড়ল হার্স্ট, তারপর ছোট্ট কাপড়ের

টুকরোটা চোখের সামনে তুলে ধরে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে ধরা গলায় বলল, 'নরেলীর ব্লাউজের টুকরো। চিঠিতে লেখা: কাপড়টা চিনতে পারবেন। কাপড়ের বাকি অংশ ও তার মালিককে পেতে হলে দশ লক্ষ ডলার লাগবে।'

পাথরের মত জমে গেল ডেকের সবাই। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সব কটা মুখ। কারও মুখে কোন কথা নেই।

'কতবার সাবধান করছি।' প্রায় কান্নার ভঙ্গিতে বলে উঠল হার্স্ট। 'কত ভাবে বুঝিয়েছি। কোন কথা শুনল না হারামজাদী মেয়ে। এখন…এখন মুঠোতে পুরে ফেলেছে ওরা ওকে।'

ওর বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। টাকার কথা ভাবছে না হেনরী হার্স্ট। ভাবছে দস্যুদের হাতে পড়ে কি হাল হচ্ছে এখন মেয়েটার, কি অবস্থায় আছে সে।

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ঘুচে গেল রানার। মুহূর্তে দারুণ ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও, হার্স্টের দুঃখে নয়, মেয়েটার অবস্থার কথা ভেবেও নয়, ওর টোপের কথা ভেবে। প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসির সাথে গিয়েছিল নরেলী। চিঠিতে যদিও তার কোন উল্লেখ নেই, তবু সহজেই বোঝা যায়, হয় মারা পড়েছে, নয়তো ধরা পড়েছে ফেরেনসি নরেলীর সাথে।

যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে কিভাবে চিনবে সে হত্যাকারীকে?

টোপ না থাকলে কিভাবে ফাঁদ পাতবে সে? খালি বড়শিতে ঠোকর দেবে না গুপ্তঘাতক।

কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে হেনরী হার্স্ট। মনের ভিতর কি চলছে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু শারীরিক কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না আধ মিনিট। তারপর হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারাল সে। পাগলের মত লাথি মারতে শুরু করল ছোকরার পেটে, পিঠে, বুকে, মাথায়।

মারাত্মক রকম জখম হলো না ছোকরা কেবল কোটিপতির পায়ের স্পঞ্জ-সোল মুকেসিনের দৌলতে।

'কোথায় আছে ও!' বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করছে সে। 'বল্, হারামজাদা, কোথায় আছে। কোথায় নিয়ে গেছে ওকে, কি করেছে!'

তারস্বরে চিৎকার করছে, আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছে ছোকরা—কিন্তু চোখে এক ফোঁটা পানি নেই।

'আমি জানি না, সিনর,…ওরে বাবারে বাবা…একটা লোক, সিনর…আর মারবেন না, সিনর…আমি কিছু…মাগো পাঁচ লিরা দিল আমাকে…উহ্—পৌঁছে দিতে বলল…মেরে ফেলল রে…ইহ্…বা-আ-বাআ-রে এ এ এ এ…'

খপ করে শার্টের কলার ধরে ছোকরাকে টেনে দাঁড় করাল হার্স্ট, ধিড়িম করে এক ঘুসিতে আবার ফেলল ডেকের উপর।

'কে?' গর্জন করে উঠল সে। 'কে লোকটা? বলতেই হবে, নইলে খুন করে ফেলব। কোন লোক?'

জবাব না দিয়ে মাটিতে শুয়ে ককাচ্ছে ছোকরা। আবার শুরু হলো লাথি-

বৃষ্টি। কেউ বাধা দিল না হার্স্টকে। একটি শব্দও উচ্চারণ করল না কোন কোটিপতি। রানা বুঝল, অদ্ভুত এক স্যাডিস্টিক আনন্দ উপভোগ করছে এরা সবাই। রোজ রোজ ঘটে না এত মজার ঘটনা।

শেষ পর্যন্ত শ্যাম্পেনের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে এগোতে হলো রানাকেই। খপ করে ধরে ফেলল সে কোটিপতির দুই হাত। কনুইয়ের একটু উপরে। ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল কয়েক পা পিছনে।

পাগলের মত রানার হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করল হার্স্ট, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ঝটকা দিল হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে। একবিন্দু নড়াতে পারল না সে হাত দুটো। রানার বজ্রমুষ্টির জোর দেখে তাজ্জব হয়ে ওর চোখের দিকে চাইল সে। রানার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'শান্ত হন,' নিচু গলায় বলল রানা। 'এই ছোকরাটাই হচ্ছে আপনার মেয়ের সাথে আপনার একমাত্র যোগসূত্র। একে মেরে ফেললে ছিঁড়ে যাবে সুতোটা। হয়তো মেয়েকে জীবনে দেখতে পাবেন না আর।'

রানাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করতে যাচ্ছিল হেনরী হার্স্ট, হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথা ঝাড়া দিল এপাশ ওপাশ। খুন চড়ে গিয়েছিল ওর, স্বাভাবিক হয়ে এল দৃষ্টিটা।

'ঠিক বলেছেন,' চাপা গলায় বলল সে। 'মাথাটা আমার···এই শুয়োরের বাচ্চাটা···' থেমে গিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে দিল হার্স্ট, 'নরম্যান। নিচে নিয়ে যাও এটাকে। তালা মেরে আটকে রাখো স্টোররুমে।'

দুইজন নাবিক চ্যাঙ-দোলা করে নিয়ে গেল ছোকরাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যার যার গ্লাসে মন দিল অতিথিবৃন্দ। খেল্ খতম।

হেনরী হার্স্টের স্টেটরুমে চারজনের মন্ত্রণাসভা বসল—হার্স্ট, জ্যাকোপো, ডেল ও রানা।

'টাকা দিতে আপত্তি নেই আমার,' বলল হার্স্ট কর্কশ গলায়। 'কিন্তু আমি চিনি এদের। টাকা পেয়ে গেলে লরেলীর জীবনের এক কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না এদের কাছে। জেম্স মিকলেমের ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল, টাকা দেয়ার তিন সপ্তাহ পর পাওয়া গেল লাশ।'

'কিন্তু পুলিসের কাছে গেলেও ঠিক এই একই ঘটনা ঘটতে পারে,' বলল জ্যাকোপো নাক চুলকে।

'পারে মানে? নিশ্চয়ই ঘটবে।' বলল কোটিপতি। 'আজ পর্যন্ত যারা সাইমন পাসেরোর টিকিও ছুঁতে পারল না তারা কি আমার মেয়ে হারানির খবর শুনে রাতারাতি এফিশিয়েন্ট হয়ে উঠবে? অসম্ভব!'

'তাহলে, হেনরী?' জ্যাক ডেলের কণ্ঠে সত্যিকারের দরদ টের পাওয়া গেল। 'কি করবে তাহলে? পুলিসের কাছে না গিয়ে আর কি করবার আছে আমাদের?'

'আমি নিজে উদ্ধার করব লরেলীকে।' চোখ পাকিয়ে জ্যাক ডেলের দিকে চাইল হার্স্ট, যেন সব দোষ ওর।

ঘরের চারপাশে চাইল রানা। বেশ বড়সড় ঘরটা, সুন্দর করে সাজানো।

প্রতিটা জিনিসে সুরুচির ছাপ রয়েছে। বিশেষ করে একপাশের দেয়াল জুড়ে সুন্দর বাঁধাই করা বইয়ের লাইব্রেরী দেখে বোঝা যায় শুধু রুচিবান নয়, লোকটা অত্যন্ত সুশিক্ষিত। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেউ বলতে পারবে না যে ও একটা রক্তলোলুপ, ক্ষুধিত, ভয়ঙ্কর, হিংস্র, বন্য জন্তু নয়। ঝাঁপ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে সে। মানুষের এমন ভয়ানক রুদ্র মূর্তি দেখেনি রানা আর।

তাহলে কি এই লোকটা মাফিয়ার নিযুক্ত হত্যাকারী নয়? নাকি কোন গোলমাল বেধে গেছে ওদের নিজেদের মধ্যে? নাকি বিশেষ কোন কারণে সাজানো হয়েছে ব্যাপারটা? সবটাই অভিনয়?

'আমার একটা পরামর্শ আছে,' বলল রানা। 'কয়েক বছর আগে, কাজ-কর্ম যখন খুব মন্দা যাচ্ছিল, আমি তখন কিছুদিনের জন্যে প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করেছিলাম। সেসব অবশ্য বেশির ভাগই ডিভোর্স কেস—হয় স্বামী, নয় স্ত্রীকে অনুসরণ করা।'

'কাজেই?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল হার্স্ট রানার মুখের দিকে।

'অনুসরণ করার কাজে খুবই দক্ষতা অর্জন করেছিলাম আমি সে সময়। ছেলেটাকে যদি টাকা দিতে সম্মত আছেন, এই মর্মে একটা চিঠি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, আমি অনুসরণ করতে পারি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল হার্স্ট রানাকে।

'হারামজাদাটা কোথায় যায় দেখলেন। তারপর।'

'তারপর ফিরে এসে রিপোর্ট করব আমি,' বলল রানা সহজ কণ্ঠে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করল হার্স্ট রানার প্রস্তাবটা নিয়ে। তারপর হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল।

'ঠিক আছে। কিন্তু এর সাথে আরও কিছু যোগ করতে চাই আমি। একটা অয়্যারলেস সেট সাথে করে নিয়ে যাবেন আপনি। এর ফলে আপনি কখন ঠিক কোথায় আছেন টের পাব আমরা। সুবিধেটা এই যে, আপনি ওদের আস্তানা খুঁজে বের করার প্রায় সাথে সাথেই আমরাও হাজির হয়ে যেতে পারব সেখানে। ঠিক আছে?'

পাশের কেবিন থেকে কয়েকটা ছোট্ট ওয়াকি-টকি ট্র্যান্সমিটার নিয়ে এল হার্স্ট। ছোটখাট, পকেট সাইজ। এক একটা সিগারেট কেসের সমান।

'হংকং থেকে কিনেছিলাম এগুলো আধ ডজন। জংগলের ভেতরে শিকারের সময় ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে খুব সুবিধে হয়। হারিয়ে গেলেও ফিরে আসতে অসুবিধে নেই।'

যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে শিখে নিল রানা কিভাবে চালাতে হয় যন্ত্রটা।

'প্রফেসার ফেরেনসির ওখানেও খোঁজ নেয়া দরকার,' হঠাৎ বলে উঠল ডক্টর জ্যাকোপো।

'চুলোয় যাক প্রফেসার ফেরেনসি!' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক ডেল। 'ওই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। ও-ই তাল তুলেছিল তীরে যাওয়ার। মেয়েটাকে

উদ্ধার করা দরকার এখন সবচেয়ে আগে। এই বদমাশদের হাতে পড়ে মেয়েটার কি সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে কল্পনা করতে পারেন?'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ডেল, কিন্তু হার্স্টের চেহারাটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে দেখে থেমে গেল চট করে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে উত্তেজনা দমন করল কোটিপতি, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'ঠিক বলেছ, জ্যাক! কিন্তু ডাক্তারও ঠিকই বলেছে। ঘটনাস্থলে আমাদের যাওয়া দরকার।' সবার মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার বলল, 'প্ল্যানটা মোটামুটি এই রকম: প্রথমে রানা নেমে যাবে ইয়ট থেকে। খুবই সতর্কতার সাথে করতে হবে কাজটা, যেন কোন অবস্থাতেই ওকে এই ইয়টের লোক বলে চিনতে না পারে ওরা কেউ। তারপর খানিক ধমক-ধামক দিয়ে চিঠি দিয়ে ছেড়ে দেব আমরা ছোকরাটাকে; ততক্ষণে তীরে পৌঁছে রানা ওদিকে ওর পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। তারপর আমরাও রওনা হব তীরের দিকে। ফেরেনসির গুহায় গিয়ে খোঁজ নেব আমরা ঠিক কি ঘটেছে ওখানে! সবার কাছেই ওয়াকি-টকি থাকছে একটা করে। পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে কোনই অসুবিধে নেই। তাছাড়া গুহায় গেলে আর একটা সুবিধে আছে। রানার সঠিক অবস্থানটা জানতে পারব আমরা তাহলে। ইয়ট আর গুহা, এই দুই জায়গা থেকে রানার রেডিওটার ক্রসবিয়ারিং পাওয়া গেলে একেবারে নির্ভুল ভাবে জানতে পারব, ঠিক কোন জায়গাটায় আছে ও। তারপর প্ল্যান করা যাবে কিভাবে আক্রমণ করব আমরা। ঠিক আছে?'

সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই উঠে দাঁড়াল হেনরী হার্স্ট।

'অস্ত্র থাকা দরকার আমাদের সবার সাথে,' বলল সে।

দেয়ালের গায়ে যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মাথা টাঙানো আছে তার নিচে ছোট্ট একটা নব ধরে টান দিতেই দেখা গেল একটা কাবার্ডের মধ্যে চমৎকার করে সাজানো রয়েছে হরেক ক্যালিবারের বিভিন্ন জাতের পিস্তল ও রিভলভার। কম করে হলেও পঁচিশ পদ।

'এসো, যার যেটা খুশি তুলে নাও।'

একটা নাইন এম. এম. লুগার তুলে নিল রানা। ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করল। গুলি ভরা আছে দেখে বার কয়েক স্লাইড টেনে বুঝে নিল খোল ইজেক্ট করবার সময় যন্ত্রটা ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। পরীক্ষা করে নিয়ে সন্তুষ্ট মনে গুঁজে দিল ওটা ওয়েস্ট ব্যান্ডের নিচে।

ডক্টর জ্যাকোপো একটা কোল্ট ফরটি-ফাইভ তুলে নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে পুরল। জ্যাক ডেলকে একখানা পয়েন্ট টু ফাইভ বেরেটা তুলে নিতে দেখে ভুরু কুঁচকাল হেনরী হার্স্ট, কিন্তু কিছু বলল না। নিজে তুলে নিল সে প্রকাণ্ড এক স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন্স পয়েন্ট ফোর ফোর ম্যাগনাম। রানার দিকে ফিরল সে।

'এটা দিয়েই মেরেছিলাম এই বাঘটাকে।'

অস্ত্রটার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে বলল রানা, 'গুলি করার প্রয়োজন হয়েছিল, না এটা দেখেই...'

মুচকি হাসি খেলেই মিলিয়ে গেল কোটিপতির ঠোঁটে।

'যান,' বলল সে। 'কাপড়টা পাল্টে নিয়েই রওনা হয়ে যান। আপনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

নয়

শুঁটকি মাছ, আলকাতরা আর ডিজেলের গন্ধ মিলেমিশে একটা উৎকট গন্ধ সৃষ্টি করেছে জেটিতে। পাকা ট্যুরিস্টের মত কাঁধে একটা সস্তাদরের কোডাক ক্যামেরা ঝুলিয়ে হাঁটছে রানা। যা ভাল লাগছে তারই ছবি তুলছে।

চার-পাঁচটা দড়ি বাঁধা জেলে নৌকো ঢেউয়ের মাথায় নাচানাচি করছে। কাছেই জাল শুকোতে দিয়ে ছেঁড়া জায়গাগুলো মেরামত করছে চার-পাঁচজন জেলে। রানাকে এগিয়ে এসে ক্যামেরা তাক করতে দেখে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে বসে পোজ দিল ওরা, ছবি তোলা হয়ে গেলে হাত বাড়াল টিপ্সের জন্যে।

কালো একটা হ্যাট পরেছে রানা মাথায়, গাঢ় একটা সানগ্লাস চোখে, চামড়ার জ্যাকেট আর কর্ডের প্যান্ট, পায়ে হকি কেডস্।

আড়চোখে দেখতে পেল সে নৌকোটা। ফিরে আসছে ছোকরা।

জেটি ছেড়ে রাস্তায় চলে এল রানা। বেশ কিছুদূর এগিয়ে একটা দোকানে কাঁচের শো-কেস সাজানো সুভেনির পরীক্ষার কাজে মন দিল সে। মিনিট দশেক পরেই কাঁচের গায়ে পরিষ্কার দেখতে পেল নৌকো বেঁধে রেখে উঠে আসছে ছোকরা।

একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। পথে অন্যান্য ট্যুরিস্টদের দিকে চেয়ে নিজেকে বাহবা দিল সে—কোন খুঁত নেই ওর সাজে। ছেলেটার আগে আগে চলেছে সে এখন।

রানা জানে বেশিক্ষণ সামনে থাকা যাবে না, কিন্তু যতক্ষণ পারা যায় সেটুকুই লাভ। সামনের লোককে অনুসরণকারী হিসেবে সাধারণত সন্দেহ করে না কেউ।

দ্রুত পায়ে হাঁটছে ছোকরা, মনে হচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছবার তাড়া আছে ওর। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পিছনে ফেলে দিল রানাকে। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে ক্রমেই পুরানো শহরের দিকে চলেছে সে।

ঝকঝকে নতুন শহর ছেড়ে চলে এল ওরা সরু গলি-ঘুঁচির পুরানো শহরে। দুঃস্থ, গম্ভীর এখানকার পরিবেশ। পাথরে খোদাই মূর্তির মত কুঁজো বুড়ি, ছোট ছোট উলঙ্গ গম্ভীর ছেলেমেয়ে, কণ্ঠার হাড় বের করা জেলে, মাঝে মাঝে কাপড়ের বোঁচকা পিঠে এক-আধটা গাধা, পিছনে ধোপানী। নিস্তরঙ্গ দরিদ্র জীবন একটানা একঘেয়ে ভাবে চলছে এসব রাস্তা দিয়ে। কারও মুখে হাসি নেই। ছায়া ছায়া আঁধার রাস্তা। সূর্যের আলো আটকে গেছে প্রায় গায়ে গা লাগানো দোতলা দালানের ছাতের কার্নিসে।

মাঝে মাঝে থামছে রানা। ছবি তুলছে। সেই ফাঁকে দূরত্বটা বাড়িয়ে নিচ্ছে দু'জনের। ডাইনে মোড় নিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে ছোকরা। সাবধানে এগোল রানাও।

একটা শুঁড়িখানা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল ছোকরাটা। দ্রুততর করল রানা চলার গতি।

একটা আধ-খোলা কাঠের দরজার ওপাশে প্রশস্ত একটা কাঁকর বিছানো আঙিনা দেখতে পেল রানা চলতে চলতে। তার ওপাশে আস্তাবল থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে। কাঁকরের উপর পা ঠুকছে আর নাক দিয়ে আওয়াজ করছে কয়েকটা ঘোড়া। গেটের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল রানা সামনে। আবছা ভাবে দেখতে পেল চট করে একটা ছায়ায় সরে গেল ছোকরাটা।

টের পেয়ে গেল নাকি? অনুসরণ করা হচ্ছে বুঝতে পেরেছে, না অন্য কারণে আত্মগোপন করছে?

আরও গজ পঁচিশেক এগিয়ে গেল রানা। ওর মনে হলো শত শত চোখ দেখছে ওকে। দেখছে, হঠাৎ এখানে ঢুকে পড়ে কি করছে বিদেশী লোকটা। এ জানালা, ও জানালা, এই ব্যালকনি, ওই ছাত—সবখান থেকে লক্ষ করা হচ্ছে ওকে, কিন্তু সরাসরি কেউ ওর চোখে চোখ ফেলছে না। হঠাৎ ঘুরে ফিরে চলল রানা যে পথে এসেছিল সেই পথে।

খোলা গেটের কাছে পৌঁছেই সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। যে ছায়ায় লুকাতে দেখেছিল ছোকরাকে সেদিকে এগোল সে।

মুখটা হাঁ করল রানা ওকে ডাকার জন্যে।

কিন্তু ঝট করে বন্ধ করে ফেলল সে মুখটা। একটা তীক্ষ্ণ ছুরির শীতল স্পর্শ পেল গলার একপাশে। এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই ঢুকে যাবে স্টীলের ব্লেড ক্যারোটিড আর্টারির মধ্যে।

আস্তাবলের ভিতর থেকে ঘোড়ার খুর ঘষার শব্দ আসছে, মাঝে মাঝে ধাতব শব্দ হচ্ছে ঘোড়ার সাজের। আর কোন শব্দ নেই। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা আঙিনার ঠিক মাঝখানে। একটা মাছি ভনভন করছে মুখের সামনে, কিন্তু ওটাকে তাড়াবার সাহস হলো না ওর।

সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ। আশ্চর্য এক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে কাঁকর বিছানো চৌকোণ আঙিনায়। কয়েক সেকেন্ড পর মৃদু শব্দ পেল রানা গেটের কাছে। বুঝল, বন্ধ করে দেয়া হলো দরজাটা।

যেমন ছিল তেমনি ধরা রয়েছে ছুরি। একচুল নড়েনি পিছনের লোকটার হাত। মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে রানার এক ইঞ্চি দূরে।

নিচু গলায় কি যেন বলল গেটের কাছের লোকটা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছোকরা। পিছনের লোকটা এক থাবা মেরে মাথার উপর থেকে উড়িয়ে দিল রানার হ্যাট।

'হ্যাঁ, এই লোকটাই,' বলল ছোকরা। 'এই লোকটাই অনুসরণ করছিল আমাকে। মনে হয় ওই ইয়টের লোক।'

'আচ্ছা!' এগিয়ে এল গেটের পাশের লোকটা। 'ছোট ছোট ছেলেদের খুব ভাল লাগে বুঝি তোমার? অ্যাঁ? পছন্দ হয়ে গেলেই পিছু নেয়ার অভ্যাস?'

'আমি কাউকে অনুসরণ করিনি,' বলল রানা। 'ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে আঙিনায় ঢুকেছি একটা ছবি তোলার জন্যে। আপনাদের আপত্তি থাকলে নাহয়…'

থেমে গেল রানা। পিচিক করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচকারির মত থুথু নিক্ষেপ করল পিছনের লোকটা রানার কান লক্ষ্য করে। গরম তরল পদার্থ অনুভব করল রানা বাম কানে, চোয়াল বেয়ে নেমে আসছে নিচে। রাগের চোটে হার্টবিট বেড়ে গেল রানার দ্বিগুণ। কিন্তু এক চুলও নড়ল না। কারণ, বুঝে গেছে সে, এরা প্রফেশনাল।

'দেখুন,' কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বলল রানা। 'আপনাদের কোন অধিকার—'

কুচ করে তীক্ষ্ণ ছুরির ডগাটা বিঁধল রানার গলায় সামান্য একটু। এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে সেখান থেকে। ওইটুকু ঢুকেই থেমে রইল ছুরিটা স্থির হয়ে।

একটু পিছনে হেলে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে রানা ছুরির চাপে। শরীরের ভার রয়েছে গোড়ালির উপর। এই অবস্থায় আঘাত করা অসম্ভব। কিছু একটা করতে হলে পায়ের সামনের দিকে ভর দিতে হবে ওকে। আর সেটা করতে গেলে, এমন কি শরীরের কোন অংশে নড়াচড়ার সামান্য একটু আভাস প্রকাশ পেলেই ঘ্যাঁচ করে ঢুকে যাবে ছুরিটা ঠিক জায়গা মত। দেরি হবে না এক সেকেন্ডও।

এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছুরি ধরার ভঙ্গি এবং ব্যবহারের নমুনা দেখেই বুঝে নিয়েছে রানা, এরা অ্যামেচার নয়। এরা খুন করেছে আগে। একবার দু'বার নয়, বহুবার। আরেকটা খুন করতে বাধবে না এদের। মানুষ খুন করা এদের কাছে মুরগী জবাইয়ের মত।

চেহারা না দেখেও পরিষ্কার এদের ছবি দেখতে পাচ্ছে রানা মানসচক্ষে। ঘন কালো চুল, বাদামী চোখ, কঠোর, আবেগবর্জিত মুখ। মাফিয়ার লোক—সন্দেহ নেই তাতে।

হঠাৎ কথা বলে উঠল ছোকরাটা।

'আমাকে ধরে পিটিয়েছে ওরা ইয়টে। আগে খানিক কিল্ ঘুসি মারতে দাও আমাকে। খানিকটা শোধ তুলে নিতে দাও।'

যেন আইসক্রীম খাওয়ার বায়না, এমনি ভঙ্গিতে বলল সে কথাটা। রানা চেয়ে দেখল, চকচক করছে ছোকরার চোখ দুটো। বয়সে নেহাত শিশু, কিন্তু বিন্দুমাত্র লালিত্য বা মাধুর্য নেই ওর মধ্যে এই মুহূর্তে।

মনে মনে একাগ্রভাবে কামনা করল রানা যেন ছোকরার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। ওকে পিটাবার অনুমতি দিলে ছুরিটা সরাতে হবে গলার উপর থেকে। সেই সুযোগে কিছু একটা করবার অন্তত চেষ্টা করতে পারবে সে। একটা কোন ডাইভারশন না পেলে এই বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর। নিশ্চিত মৃত্যু এড়াবার কোন পথই নেই আর।

'না,' পিছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল ছুরি ধরা লোকটা। 'হাতে সময় নেই। একে মেরে রেখে এখুনি বেরোতে হবে আমাদের।'

রানা বুঝল, সময় উপস্থিত। আর কোন আশা নেই। সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে আজ।

বহুবার বহু বিপদে পড়েছে রানা। সত্যি কথা বলতে কি, বিপদ নিয়েই ওর কারবার। বহুবার দাঁড়াতে হয়েছে ওকে মৃত্যুর মুখোমুখি। কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় বোধহয় মৃত্যুর এতটা কাছে আসেনি সে জীবনে কোনদিন। কোনরকম চেষ্টার সুযোগ পাবে না সে। অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে, ঠিক যেমনভাবে হাঁস-মুরগী জবাই করা হয়, তেমনি ভাবে আর্টারির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হবে ছুরিটা, একপাশে সামান্য একটা ঝাঁকি দিলেই দু'ফাঁক হয়ে যাবে কণ্ঠনালী, মাটিতে আছড়ে পড়ে খানিকক্ষণ ধড়ফড় করবে ওর শরীরটা, পা আছড়াবে নিজের অজান্তেই। ওর প্যান্টের পিছনে ছুরিটা মুছে নিয়ে চলে যাবে এরা নিজের কাজে। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করবে না। কোন যুক্তি তর্ক টিকবে না এদের কাছে। কোন কথাই শুনতে চায় না এরা ওর। নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক।

কিছু করতে হলে এক্ষুণি করা দরকার। এখন যে কোন মুহূর্তে জায়গামত ঢুকে যাবে ছুরিটা। শরীরের কোথাও কোন পেশী শক্ত হয়ে উঠতে দেখলেই ছুরি চালাবে লোকটা, এক ইঞ্চি নড়বার আগেই শেষ হয়ে যাবে সে। অথচ কিছু করা দরকার।

হঠাৎ 'ক্যাঁচ' শব্দ করে উঠল গেটটা। সামান্য একটু। পিছনে কে কি করছে দেখতে পেল না রানা, কিন্তু আঁচ করে নিতে দেরি হলো না ওর। সামনে দাঁড়ানো ছোকরাটা ঝট করে ফিরেছে গেটের দিকে।

শুধু একটা পলক সময় পেল রানা। কাজে লাগাল সে মুহূর্তটিকে। ধাঁই করে কনুই চালাল পিছন দিকে, বাম পায়ে চালাল লাথি, সেই সাথে বিদ্যুৎবেগে গলাটা সরিয়ে নিল একপাশে এবং বসে পড়ল। ছুরিটা কেবল খচ্ করে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য আলগা করে ধরা ছিল পিছনের লোকটার হাতে, আচমকা পেটের উপর কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে হাত থেকে খসে পড়ল ওটা কাঁকরের উপর। চট করে ছুরিটা তুলে নিয়েই তড়াক করে লাফ দিল রানা সামনের দিকে।

পিছনে ছোট্ট একটা গর্জন শুনতে পেল ও, তাড়াহুড়ো করে এগুতে গিয়ে কাঁকরের উপর পা ফসকে যাওয়ার আওয়াজ পেল। দ্রুত এগিয়ে এসে ছুরি চালিয়েছিল দ্বিতীয় লোকটা, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো পা পিছলে যাওয়ায়।

ঝট করে ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়াল রানা। জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে এনেছে সে বাম হাতে।

একই চেহারার দু'জন যুবক। সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানার দিকে চেয়ে। একজনের খালি হাত। অপরজনের হাতে ঠিক রানার হাতে ধরা ছুরিটার মত দেখতে আর একটা সরু দশ ইঞ্চি ব্লেডের ছুরি।

'পিস্তল!' চাপা গলায় সাবধান করল ছোকরা। বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ। 'পিস্তল বের করেছে!'

'চুপ কর্, ছোঁড়া!' ধমকে উঠল একজন। 'সরে যা ওখান থেকে।'

তাগড়া জোয়ান দু'জন। দুই ভাই খুব সম্ভব। পাহাড়ী এলাকার কৃষকের পোশাক পরা, পায়ে ভারী বুট। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একই রকম দু'জন। একই রকম হিংস্র ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। দুই জোড়া সাহসী চোখ স্থির হয়ে আছে রানার চোখে।

ছুরি ধরা যুবক বলল, 'গুলি করবে না ও। অন্তত আমাদের এই এলাকায় না। এখানে একটা গুলির আওয়াজ হলে এক হাজার জন ছুটে আসবে চারপাশ থেকে।'

কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারল রানা। এখানে পিস্তল ব্যবহার করা মানে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনা। একেবারে শেষ অবস্থায় না পৌঁছলে গুলি না করার সিদ্ধান্ত নিল সে। মরার আগে অন্তত দশজনকে খতম করে তারপর মরবে সে।

কাঁকড়ার মত এগিয়ে আসছে দু'জন। দু'পাশ থেকে আক্রমণের জন্যে সরে গেল একে অপরের থেকে। চট করে গেটের দিকে চাইল রানা একবার। সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে ওটা, কেউ ঢুকল না ভিতরে। খুব সম্ভব বাতাসের ধাক্কায় আওয়াজ হয়েছিল গেটে।

পিছনে সরতে সরতে আস্তাবলের দেয়ালের গায়ে গিয়ে ঠেকল রানা।

একজোড়া উৎসাহী চকচকে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে ছোকরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। খুন জখম দেখে অভ্যাস আছে ওর। ওর দু'চোখে ফলাফল জানার আগ্রহ।

আস্তাবলের এবড়োখেবড়ো পাথুরে দেয়ালটা পিঠে ঠেকতেই নিশ্চিন্ত হলো রানা, পিছন থেকে কেউ আর আক্রমণ করতে পারবে না ওকে।

আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে ঘোড়ার মল-মূত্রের তীব্র গন্ধ আসছে। মাথা ঝাড়া দিয়ে পা ঠুকছে ঘোড়াগুলো, ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করছে নাক দিয়ে।

ছুরিহীন যুবক রানার চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই ধীরে ধীরে খুলে ফেলল জ্যাকেটটা গা থেকে। সামনে বাড়িয়ে ধরে আছে সে ওটা। প্রয়োজন হলে ছুঁড়ে মারবে ওটা রানার মুখের উপর, রানা ছুরি চালালে বাধা দেবে ওটা দিয়ে, সুযোগ পেলে ছুরি সহ পেঁচিয়ে ধরবে ওটা দিয়ে রানার ডান হাত।

অপরজন ছোরা-ফাইটারের মত নিচু করে ধরে রেখেছে ছুরিটা। বুড়ো আঙুল ব্লেডের উপর। পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে রয়েছে সে। যে কোন মুহূর্তে লাফ দেবে সামনের দিকে, ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিয়েই টান দেবে উপর দিকে, তারপর এক প্যাঁচ দিয়ে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনবে নাড়িভুঁড়ি।

মাত্র দুই গজ দূরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা এখন। ডানদিকে ছুরিওয়ালা, বাম

দিকে জ্যাকেটওয়ালা। দু'জনের ঠোঁটে অদ্ভুত বাঁকা হাসি। ভয়শূন্য দু'জোড়া চোখ। বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে তেমনি সতর্ক খেলা খেলছে যেন ওরা। জয়-পরাজয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই ওদের কারও মনে। ওরা জানে মারা যাবে রানা, কিন্তু কেমন ভাবে মরে, কিভাবে কাৎরায় সেটাই দেখার বিষয়।

ছুরি-হাতে লোকটা নিচু হয়ে বাম হাতে দুটো টোকা দিল মাটিতে। এটা অপর জনের প্রতি আক্রমণের ইঙ্গিত। কিন্তু তার বদলে আক্রমণ করে বসল রানা।

আস্তাবলের দেয়ালে এক পা বাধিয়ে ঝাঁপ দিল সে ছুরিহীন যুবকের দিকে। বাম হাতে ধরা পিস্তলটা দিয়ে দড়াম করে মারল ওর নাকের উপর। মুহূর্তে যুবকের সারাটা মুখ কুঁচকে গেল তীব্র, অসহ্য যন্ত্রণায়। নরম হাড় ভেঙে দিয়ে থেঁতলে গেছে নাকটা। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে, চোখ মুখ বিকৃত করে বসে পড়ল সে মাটিতে।

কিন্তু এসব দেখবার সময় পেল না রানা। একজনের নাকের উপর মেরে দিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে দ্বিতীয়জনের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে।

দেয়ালের দিকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে মাঝপথে দিক পরিবর্তন করতে হলো দ্বিতীয়জনকে। লাফিয়ে চলে এল সে রানার কাছে, কিন্তু স্টেপিং গোলমাল হয়ে যাওয়ায় প্রায় অন্ধের মত ছুরি চালাল আনাড়ী ভঙ্গিতে।

বিদ্যুৎবেগে ছুরি চালাল রানা। ঠিক মাঝপথে থেমে গেল যুবকের ছুরি-ধরা হাতটা। জ্যাকেট ফুটো করে ঢুকে গেছে রানার ছুরি, ডান বাহু এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেই সাথে জুজুৎসুর ল্যাঙ মারল রানা এবং সেইসাথে হ্যাঁচকা টান মারল ছুরিটা নিচ দিকে। ঘ্যাচ করে মাংস আর জ্যাকেট কেটে বেরিয়ে এল ছুরি। দু'ফাঁক হয়ে গিয়ে হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল যুবক।

মাটিতে পড়েই আবার তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল ছুরিটা, চট করে ধরল সেটা বাম হাতে। ফিরল রানার দিকে। রানা দেখল ভয়ের লেশমাত্র নেই ওর দৃষ্টিতে। হাসিটা মুছে গেছে ঠোঁট থেকে, দূর হয়ে গেছে খেলা খেলা ভাবটা। বুঝে গেছে সে, ছাগল-জবাই হওয়ার লোক এ নয়। ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ ডিঙিয়ে পরাস্ত করতে হবে একে। ওর দুই চোখের দৃষ্টিতে রানার মৃত্যু কামনা। একবার চাইল সঙ্গীর দিকে। কাঁকরের উপর বসে দুই হাতে নাক মুখ চেপে ধরে আছে সে, টপটপ রক্ত ঝরছে, মাথাটা দু'পাশে নেড়ে যন্ত্রণার ঘোরটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

হিংস্র একটা গর্জন করে আবার ঝাঁপ দিল ছুরি-হাতে যুবক।

এবারও ঠিক মাঝপথে বাধা দিল রানা ওকে। ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে ছুরি চালাল উপর দিকে। খটাং করে বাড়ি খেলো দুটো ছুরি। অকেজো ডান হাতটা মুগুরের মত ব্যবহার করে রানার মাথায় আঘাত করবার চেষ্টা করল লোকটা। তাজা রক্ত ছিটকে এসে পড়ল রানার চোখে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না রানা। ঠেলে নিয়ে গেল ওকে আস্তাবলের দেয়ালের কাছে।

প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করল যুবক ছুরিটা রানার দিকে ফেরাতে, কিন্তু

রানার হাতটা নিচে থাকায় কিছুতেই পারল না। ধীরে ধীরে রানার ছুরিটা ফিরছে ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে, ওর নিজেরটা সরে যাচ্ছে অন্যদিকে।

কাঁকরের উপর নড়াচড়া টের পেয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল রানা। কুচ করে আধ ইঞ্চি মত ঢুকে গেল ছুরি পাঁজরের হাড়ের নিচে দিয়ে। এদেশী লোক হলে এখন একটানে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে পেটের মধ্যেকার সবকিছু বাইরে বের করে এনে মনে করত কাজের কাজ হয়েছে। কিন্তু রানা জানে, ভুঁড়ি ফাঁসানোটা আসলে কিছুই নয়। নাড়িভুঁড়ি পাকস্থলি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এই অবস্থাতেও মানুষ হানতে পারে মরণাঘাত। কাজেই কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না এখন।

শীতল ছুরিটা শরীরের মধ্যে ঢুকতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা, ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দুটো। পরমুহূর্তে ঘ্যাচ করে ঢুকে গেল সেটা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। মুহূর্তে ঢিল হয়ে গেল লোকটার সর্বাঙ্গ।

ছুরিটা ধরে থাকা অবস্থাতেই ঝট করে পাশ ফিরল রানা।

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে ডাইভ দিয়েছে পিছনের লোকটা। জায়গা থেকে না নড়েই লাথি চালাল রানা। উড়ন্ত অবস্থাতেই ঠিক জায়গা মত পড়ল লাথিটা। চিবুকের নিচে ঠিক কণ্ঠনালীর উপর। ধড়াস করে রানার পায়ের কাছে পড়ল আক্রমণকারী। আর নড়ল না।

এইবার একটানে বের করে আনল রানা ছুরিটা মৃতদেহের ভিতর থেকে। হেলে পড়ে গেল লাশটা একপাশে। একহাতে পিস্তল, এক হাতে রক্তাক্ত ছুরি নিয়ে ছোকরার দিকে এগোল এবার সে।

'এইবার তুমি!' দাঁত কিড়মিড় করল রানা। বিকট করে ফেলল চেহারাটা, 'এইবার তোমাকে বলতে হবে ইয়টের সেই সিনরিনা কোথায়। বলতে হবে কারা ধরেছে ওকে। কোথায় রাখা হয়েছে ওকে আর প্রফেসার ফেরেনসিকে...'

ভয়ে কপালে উঠল ছোকরার চোখ। হাঁ হয়ে আছে মুখ। কাঁপা কাঁপা শ্বাস নিচ্ছে মুখ দিয়ে আবছা ফোঁপানির মত। পিছিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। এগোচ্ছে রানা।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর মূর্তি ওর। শাসানির ভঙ্গিতে রক্তাক্ত ছুরিটা সামনে বাড়িয়ে আবার পিছিয়ে নিল। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাবার চেষ্টা করল ছোকরা।

পিছোতে পিছোতে আস্তাবলের দরজার কাছে এসেই হঠাৎ ককিয়ে উঠে দৌড় দিল সে ভিতর দিকে। এক লাফে এগিয়ে এল রানা। ছোকরা পালিয়ে গেলে আরও লোক ডেকে নিয়ে আসবে এখুনি।

কিন্তু পালায়নি ছোকরা। পালাবার পথ নেই।

হুড়মুড় করে পড়ল গিয়ে সে প্রকাণ্ড একটা ঘোড়ার গায়ের উপর। চিঁহিঁহিঁ আওয়াজ পাওয়া গেল। কেমন একটা ধস্তাধস্তির শব্দ হলো। পরমুহূর্তে প্রায় উড়ে বেরিয়ে এল ছোকরা আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে। চিৎ হয়ে পড়ল কাঁকর বিছানো আঙিনায়। কপালটা ইঞ্চি দেড়েক ঢুকে গেছে মাথার ভিতর

প্রচণ্ড লাথি খেয়ে।

সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। কোনদিন আর কোন কথা আদায় করা যাবে না ওর কাছ থেকে।

আঙিনার একপাশে একটা বালতিতে টপটপ পানি পড়ছে একটা লিক হয়ে যাওয়া পাইপ থেকে। ভরা বালতির দিকে এগিয়ে গেল রানা।

হাতমুখ থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলল ও, রুমাল ভিজিয়ে দাগ তুলে ফেলল জ্যাকেট থেকে। ছুরিটা ছেড়ে দিল বালতির মধ্যে—আঙুলের ছাপ পাবে না কেউ ওতে আর।

এদিক ওদিক চাইল রানা। শুঁড়িখানার একপাশের দরজা দেখা যাচ্ছে। ওখানেই বন্দি করে রাখা হয়েছে লরেলীকে? আস্তাবলের ওপাশে কোন দরজা নেই, দেখে নিয়েছে সে এক নজর। এখন কি শুঁড়িখানায় ঢুকে খোঁজ করবে, না ফিরে গিয়ে খবর দেবে হার্স্টকে?

চারপাশের বাড়িগুলোর উপর নজর বোলাল রানা। কেউ দেখে ফেলেছে ওদের এই খুনোখুনি? এখনই পৌঁছে যাবে দলবল নিয়ে? কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো ওর কাছে। গেটের দিকে তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। ঝট করে বের করল পিস্তল। নড়ে উঠেছে দরজা।

দমাদম বাড়ি পড়ল গেটের গায়ে। কড়া ধরে নাড়ল কে যেন।

পরমুহূর্তে ভেসে এল ডক্টর জ্যাকোপোর কণ্ঠস্বর।

'রানা! মাসুদ রানা! আপনি কি এখানে?'

পকেটে রাখা ওয়াকি-টকির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল রানা। এরই পাঠানো সিগন্যাল অনুসরণ করে ঠিক জায়গা মত এসে পৌঁচেছে ডাক্তার। ছুটে গিয়ে গেটের হাতল ধরে টান দিল রানা। খোলাই ছিল গেট।

'আস্তে।' ঠোঁটে আঙুল চেপে ইঙ্গিত করল রানা। 'লরেলীকে খুব সম্ভব আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই পাশের শুঁড়িখানায়…'

'নেই এখানে,' বলল ডাক্তার জোর গলায়। 'পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেছে ওরা ওকে। চলে আসুন, জলদি!'

ছুটে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল ওরা।

দশ

ছুটে চলেছে ট্যাক্সি।

'রাটল্যান্ড মারা গেছে,' বলল ডাক্তার। 'খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে গুলি। গুরুতর জখম হয়েছে জন ক্রেইগ। ওকে ফার্স্ট এইড দিয়ে হাসপাতালে রওনা করে দিয়েই আপনাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি আমি। মেয়েটাকে নিয়ে ওরা পাহাড়ী এলাকায় চলে গেছে। হেনরী পায়ের ছাপ দেখে অনুসরণ করছে ওদের।'

'প্রফেসার ফেরেনসির খবর কি? সে কোথায়?'

'তার কোন পাত্তাই নেই। হয় তাকেও ধরে নিয়ে গেছে, নয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও। জানি না।'

না জানলে তো চলবে না—ভাবল রানা। ওর কাছে লরেন্সীর চেয়ে প্রফেসারের গুরুত্ব অনেক বেশি। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্রেইগের অবস্থা খুব খারাপ?'

'হ্যাঁ। আজও সর্টিং করছিল টেবিল-চেয়ার পেতে। গুলিটা কাঁধ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখলাম একমাত্র ভরসা এখন ব্লাড ট্র্যান্সফিউশন, জ্যাককে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি হাসপাতালে। ফেরার পথে থানায় খবর দিয়ে আসবে।'

'মজুররা কোথায়?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'আমরা গিয়ে কাউকে পাইনি। ক্রেইগের দুই একটা টুকরো কথায় জানা গেছে ব্যাপারটা। জলপাই জঙ্গলের ওপাশ থেকে গুলি আরম্ভ হয়েছিল আচমকা।'

কুঁড়েঘরের কাছাকাছিই চিৎ হয়ে পড়ে আছে হ্যারি রাটল্যান্ড। ঘিলু বেরিয়ে গেছে। যন্ত্রণার মুহূর্তে ভয়ানক ভাবে কুঁচকে গিয়েছিল মুখটা—সেই অবস্থাতেই আছে। বীভৎস! ফুটো হয়ে যাওয়া খুলির মধ্যে কয়েকটা মাছি অবাধে ঢুকছে, বেরোচ্ছে।

চারপাশে এক নজর চেয়েই আন্দাজ করতে পারল রানা, ঠিক কোন্ জায়গা থেকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল। সোজা সেদিকে হেঁটে গিয়ে ঘাসের উপর কয়েকটা কোল্ট ফরটিফাইভ রিমলেস অটোমেটিকের চকচকে খোল দেখতে পেল সে। অ্যামবুশের সময় সাধারণত ভারী কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আক্রমণ হয়েছে পিস্তলের সাহায্যে। কেমন যেন খটকা লাগল ওর মনে। ভেবে নিল, অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা চমৎকার, পাল্টা আক্রমণ হলে আত্মগোপন করবার খুবই সুবিধে, তাছাড়া পিছনে কমলা লেবুর বাগানের মধ্যে দিয়ে সুন্দর এসকেপ রুট রয়েছে, তেমন বিপদ দেখলে সটকে পড়লেই হলো—তাই বোধহয় ভারী কোন অস্ত্র ব্যবহার করেনি মাফিয়া এখানে। এমনও হতে পারে, কোনরকম প্রতিরোধ আশা করেনি বলেই পিস্তল নিয়েই আক্রমণ করেছে ওরা।

কথাটা ভাবা মাত্র দ্রুতপায়ে ফিরে এল রানা রাটল্যান্ডের পাশে। অবাক হয়ে গেল ডাক্তার।

'কি ব্যাপার? ফিরে এলেন যে? এগোতে ভয় করছে? ওই পথেই তো গিয়েছে হেনরী।'

কোন জবাব না দিয়ে রাটল্যান্ডের হাতে ধরা রিভলভারটা খসিয়ে আনল রানা শক্ত হয়ে যাওয়া আঙুল ছাড়িয়ে। প্রথমে নলটা শুঁকে দেখেই বুঝতে পারল এ থেকে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি আজ। সিলিন্ডারটা খুলেই প্রায় চমকে উঠল সে। ছয়টা খোল পোরা রয়েছে ছয়টা চেম্বারে, গুলি নেই একটাও। খোলগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেল তিনটে খোলের গায়ে দুটো

করে হ্যামারের আঘাতের চিহ্ন। তার মানে মরার আগে তিনবার ট্রিগার টেপার সুযোগ পেয়েছিল রাটল্যান্ড। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য, গুলিগুলো বের করে নিয়ে রিভলভারের চেম্বারে খালি কার্তুজের খোল পুরে দিয়েছিল কেউ আগে থেকে।

ক্রেইগের চেয়ারে ভারী দেহটাকে বিশ্রাম দিচ্ছিল ডক্টর জ্যাকোপো, রানার এই অদ্ভুত ব্যবহারে উঠে এল। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রানার হাতে ধরা রিভলভারটার দিকে।

'কি ব্যাপার? কি হলো?'

এবারও জবাব দিল না রানা। দ্রুতহাতে খোলগুলো যেমন ছিল তেমনি পুরে দিয়ে রিভলভারটা রাটল্যান্ডের বুকের উপর রেখে দাঁড়াল। বোঝা গেল কেন প্রতিরোধের আশঙ্কা করেনি মাফিয়া। ওরা জানত, গুলি নেই রাটল্যান্ডের রিভলভারে। ডাক্তারের দিকে ফিরল রানা।

'আপনি এখানেই থাকুন। সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন চারপাশে।'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না ও। প্রায় দৌড়ে চলে গেল জলপাই জঙ্গলের আড়ালে।

নরম মাটিতে পায়ের দাগ অনুসরণ করা সহজ, কিন্তু শক্ত জায়গায় কোন চিহ্ন দেখতে পেল না রানা। সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর চলতে হচ্ছে ওকে। কিছুদূর এগিয়ে আবার নরম মাটিতে পায়ের চিহ্ন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়াচ্ছে চলার গতি। এইভাবে খানিকক্ষণ চলবার পরে ঠিক কোন্ দিক বরাবর গেছে ওরা বুঝে নিল সে মোটামুটি। হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে না থাকলে ঠিকই পৌঁছবে সে শেষ পর্যন্ত।

হার্স্টের কথা ভেবে মুচকি হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে। পাকা শিকারীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে এখন। কতশত বন্য জন্তুর পায়ের ছাপ অনুসরণ করেছে হার্স্ট তার ইয়ত্তা নেই। সেসব ছিল আনন্দ, খেলা। আজ এটা ওর মেয়ের জীবন-মরণ সমস্যা। মাইল খানেক আগে এই কমলা লেবুর বাগানেরই কোথাও মাটিতে পায়ের চিহ্ন খুঁজছে লোকটা, এগোচ্ছে সতর্ক পায়ে।

মিনিট বিশেক চলার পর একটা টিলার মাথায় উঠে হার্স্টকে দেখতে পেল রানা। মাইল দেড়েক দূরে ডান দিকে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওই পর্যন্ত সোজা গিয়ে ডান দিকে পাহাড়ী এলাকার দিকে চলে গেছে ওরা লরেলীকে নিয়ে। মনে মনে হিসেব করে একটা টিলার মাথায় ডুমুর গাছ লক্ষ্য করে এগোল সে এবার। হার্স্ট যেদিকে এগোচ্ছে সেদিকেই যদি এগোতে থাকে, তাহলে এই ডুমুর গাছের কাছে এসে দেখা হবে দু'জনের। কোনাকুনি পথে দ্রুত পা চালাল রানা। কারও পদচিহ্ন অনুসরণ করবার দরকার নেই বলে চড়াই-উৎরাই ভেঙে মিনিট পনেরো হেঁটেই পৌঁছে গেল সে নির্ধারিত জায়গায়। গজ পঞ্চাশেক আগে আগে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাটি পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলেছে হার্স্ট।

হাঁক ছাড়ল রানা।

পিছন ফিরে রানাকে দেখল কোটিপতি, কিন্তু থামল না। এগিয়ে চলল

মাটির দিকে চোখ রেখে। তিন মিনিট জোরে হেঁটে হার্স্টকে ধরে ফেলল রানা।

'এইখানটায় এসে দুই ভাগ হয়ে গেছে ওরা। দেখেছেন? দু'জন চলে গেছে শহরের দিকে।'

'ওদের সাথে দেখা হয়েছে আমার,' সহজ কণ্ঠে বলল রানা।

'তৃতীয়জন লরেলীকে নিয়ে এই পথে গেছে।'

এগোল ওরা। আসলে এগোচ্ছে হার্স্ট, রানা অন্ধের মত অনুসরণ করছে ওকে। কি দেখে যে ওদের গতিপথ বুঝছে হার্স্ট সেটাও রানার বোধের অগম্য। তবু ভুল পথে যে এগোচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ চলবার পর নরম মাটিতে পায়ের ছাপ দেখে। দু'জোড়া পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। একজোড়া বুটজুতো, অপর জোড়া হাইহিল। আর কিছুদূর এগিয়েই হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল হার্স্ট।

'ভেরি গুড! ওই শিকড়টায় হোঁচট খেয়ে পা মচকে গেছে লরেলীর। খোঁড়াচ্ছে এখন।'

'এটা সুখবর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চয়ই। গতি কমাতে বাধ্য হবে।'

কমলা বাগান ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা অনেকক্ষণ। হাঁটু সমান উঁচু গম খেতের উপর দিয়ে চলেছে এখন লম্বা পা ফেলে। বেশ কষ্ট হচ্ছে পায়ের চিহ্ন খুঁজে বের করতে। দূরে দূরে এক-আধজন কৃষক দেখা যাচ্ছে, কাজ করছে মাঠে।

একজনকে ডাকল হার্স্ট।

'ঘণ্টাখানেক আগে এখান দিয়ে গেছে একজন লোক একটা মেয়েকে সাথে নিয়ে। কোনদিকে গেছে ওরা?'

হার্স্টের হাতে এক হাজার লিরার নোট দেখে চকচক করে উঠল প্রৌঢ় লোকটার চোখ দুটো। ওর ভাঁজ পড়া কপাল আর কর্মঠ দুই আড়ষ্ট শক্ত হাত দেখে টের পেল রানা সাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও হাজার লিরা রোজগার হয় না লোকটার। কিন্তু মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল ওর চোখ দুটো। ধীরে মাথা নাড়ল দু'পাশে।

'আমি কাউকে দেখিনি, সিনর।'

এবার দশ হাজার লিরার নোট বের করল হার্স্ট। লোভের সাথে সাথে ভীতি দেখা দিল লোকটার চোখে। ঝট করে পিছন ফিরল, পা বাড়াল কাজে ফিরে যাওয়ার জন্যে।

'কাউকে দেখিনি আমি। কিচ্ছু দেখিনি।'

'এক লাখ লিরা দেব!' চেঁচিয়ে উঠল হার্স্ট। 'এই দেখ। সাথেই আছে আমার।'

দুই হাতে নিজের দু'কান চেপে ধরল লোকটা। কোন কথা শুনবে না সে। পিছন ফিরল না।

'জানি না। কিচ্ছু জানি না আমি। চলে যান, সিনর।'

'মরে যাওয়ার চেয়ে গরীব হয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল,' বলল রানা। 'টাকায় কোন কাজ হবে না, মিস্টার হার্স্ট। মাফিয়ার ভয়ে কুঁকড়ে আছে ও।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে নোটের তোড়ার দিকে চেয়ে রইল হার্স্ট কয়েক সেকেন্ড। টাকায় কাজ হচ্ছে না এমন ঘটনা ওর জীবনে বিরল। টাকা থাকলেই যে সব সময় বাঘের চোখ পাওয়া যায় না তা উপলব্ধি করতে পেরে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নোটগুলো হিপ পকেটে গুঁজে রেখে পা বাড়াল সে সামনের দিকে।

'কষ্ট করেই কেষ্ট পেতে হবে আমাদের,' বলল হার্স্ট।

মাঠ-ময়দান, খেত-খামার, কমলা-জলপাই-ডুমুর বাগান আর শুকিয়ে যাওয়া খাল-বিল পেরিয়ে ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। শিকারী হাউন্ডের মত এগিয়ে চলেছে হার্স্ট ওর আশ্চর্য অনুসরণক্ষমতা দেখিয়ে রানাকে তাজ্জব করতে করতে। এক এক সময় রানার মনে হয়েছে বুঝি ভুল পথে এগোনো হচ্ছে, কিন্তু আবার কিছুদূর গিয়ে স্পষ্ট পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

মাঝে মাঝে পাকা সড়ক পড়ছে পথে, রাস্তার ওপাশে আবার পায়ের চিহ্ন খুঁজে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না হার্স্টের।

'খুবই অসাবধান,' হঠাৎ কথা বলে উঠল হার্স্ট। অনেকটা আপন মনেই। 'বোঝা যাচ্ছে আমার শিকার-খ্যাতি ওদের কানে পৌঁছোয়নি। হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি এতদূর পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে আসা সম্ভব হবে আমার পক্ষে। সোজাসুজি বোকার মত রাস্তা পেরিয়েই নেমে গেছে ওপাশে। একটু বুদ্ধি থাকলে পাকা রাস্তা ধরে শখানেক গজ এগিয়ে মাঠে নামত। তাহলে আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যেত অনুসরণ করা। কিন্তু ভাবছি, গাড়ি ঘোড়া কিছু ব্যবহার না করে এই বন-বাদড় ভেঙে এগোচ্ছে কেন?'

'রাস্তা দিয়ে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল,' বলল রানা। 'ওরা জানে, সারা পালারমোর পুলিস তৎপর হয়ে উঠবে লরেলী হার্স্টকে উদ্ধার করবার জন্যে। সড়কগুলোর উপর কিছুটা আইনের শাসন আছে। কাজেই ওদের পক্ষে রাস্তা এড়িয়ে চলাই স্বাভাবিক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হার্স্ট। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট পুলিসের দল দেখেছে ওরা। সার্চ পার্টি বেরিয়েছে ঠিকই কিন্তু এদের মধ্যে কোনরকম উৎসাহের বিন্দুমাত্র আভাস দেখা যায়নি। বেগারশোধ দেয়ার মত করে খুঁজছে ওরা, মাঝে মাঝে এক-আধটা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছে বেয়োনেট দিয়ে অলস ভঙ্গিতে। ধরেই নিয়েছে ওরা, পাওয়া যাবে না দুষ্কৃতকারীকে। শুধু শুধু নিজেদের শরীরকে কষ্ট না দিয়ে দায় সারছে ওরা।

একবার এক কর্পোরাল তো ওদেরই ধরে বসল মাফিয়ার লোক হিসেবে। গোটাকয়েক হাজার লিরার নোট হাতে গুঁজে দেয়ায় বিশ্বাস করল যে ওরা খারাপ লোক নয়। কিন্তু পাহাড়ী এলাকার দিকে এগোতে দেখে সাবধান করল ওদিকটা ভাল এলাকা নয়, খুবই খারাপ লোকের পাল্লায় পড়বার

সম্ভাবনা আছে।

এদিকটা শুকনো এলাকা। কাঁটা গাছ আর সুমাখের ঝোপ, কর্কশ পাহাড়ী মাটি, মাঝে মাঝে শুকিয়ে আসা ঝর্ণা, বড় বড় পাথর। লোকালয় নেই। শহরের ট্যানারিতে বিক্রির জন্যে সুমাখ পাতা সংগ্রহরতা এক বুড়ি ছাড়া আর একটি জনমনিষ্যি দেখতে পায়নি ওরা আধঘন্টার মধ্যে। লরেলীর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি ওর কাছে। প্রশ্ন শুনে ফোঁকলা দাঁতে হেসেছে, তারপর এমন এক গ্রাম্য দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শুরু করেছে যে পালিয়ে বেঁচেছে ওরা। আবার গাধার পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে সুমাখ পাতা ভরার কাজে মন দিয়েছে বুড়ি অগত্যা।

আরও আধ ঘণ্টা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে চলার পর একটা কাঁটাগাছ ভর্তি টিলার পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল হার্স্ট। রানাও দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনে। নিচু হয়ে ঝুঁকে কি যেন পরীক্ষা করছে হার্স্ট মাটিতে। একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল হার্স্টের প্রকাণ্ড কাঁধ, কান দুটো লালচে দেখাচ্ছে।

'রক্ত!' মনের উত্তেজনা চেপে রেখে শান্ত কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল হার্স্ট শব্দটা, কিন্তু কেঁপে গেল গলার স্বর। 'রক্ত দেখা যাচ্ছে।'

রানাও দেখতে পেল। কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে শক্ত মাটিতে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল হার্স্ট শুকোয়নি এখনও। ধীরে ধীরে ফিরল রানার দিকে। খুনীর ফাঁকা দৃষ্টি দেখতে পেল রানা ওর চোখে। খ্যাপাটে চোখে রানার মাথা থেকে বুক পর্যন্ত বার কয়েক দৃষ্টি বুলাল কোটিপতি।

'খুন করব আমি হারামজাদাকে,' বলল সে চাপা গলায়।

পাহাড়ে উঠে গিয়ে আরও কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখা গেল। কোন রকম পায়ের চিহ্ন নেই এখানে। ওদের গতিপথ কিভাবে নির্ধারণ করছে সে শুধু হার্স্টই জানে। খুব সম্ভব আন্দাজের উপর চলছে সে এখন। কোথাও হয়তো একটা দুমড়ানো আগাছা দেখতে পাচ্ছে, কিংবা হয়তো অপেক্ষাকৃত নরম মাটির উপর দেখা যাচ্ছে কোন পাথর হড়কে যাওয়ার চিহ্ন। সরু গিরিসঙ্কটের দিকে উঠে যাচ্ছে ওরা ক্রমে।

বেশ কিছুটা ওঠার পর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল হার্স্ট আবার। রানাকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে দেখে চাপা গলায় বলল, 'আর এক মিনিট কি দুই মিনিটের মধ্যে দেখা পাব আমরা ওদের। খুব সম্ভব সামনের উপত্যকাতেই।'

মাটির উপর হালকা পায়ের ছাপগুলো আবার একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে বলল, 'লরেলীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন লোকটা। এই চড়াই ভেঙে বেশি দূর এগোতে হবে না ওকে।'

'বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বুঝলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানে এসে আবার পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে হঠাৎ ওজন বেড়ে গেছে লোকটার। কিন্তু লরেলীর পায়ের কোন ছাপ নেই। খানিকটা ধস্তাধস্তি হয়েছে এই জায়গায়,' কথাটা বলতে বলতে ভয়ঙ্করদর্শন স্মিথ অ্যান্ড

ওয়েসন্স পয়েন্ট ফোর ফোর ম্যাগনাম বের করল হার্স্ট। 'পিঠে তুলে নিয়েছে লরেলীকে। আসুন।'

এগোতে বলেও থেমে দাঁড়িয়ে রানার দিকে হাত বাড়াল হার্স্ট।

'পিস্তলটা দিন।' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাতটা ঝাঁকাল সে। 'আমি চাই না ও আপনার গুলিতে মারা যাক। ও আমার।'

'আরও লোক যদি থাকে?' তর্ক করার চেষ্টা করল রানা। 'ওদের আস্তানার খুব কাছে চলে এসেছি মনে হচ্ছে! হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে...'

'সে ভয় নেই,' বলল হার্স্ট। পিস্তলটা নিল রানার হাত থেকে। 'আর কোন লোক নেই ওর সাথে। সম্পূর্ণ একা আছে ও। আমার মনে হয় আস্তানার দিকে যাচ্ছে না লোকটা। যাই হোক, অন্য লোক যদি থাকে, ফেরত পাবেন পিস্তল।'

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা সতর্ক পদক্ষেপে। চুড়োর কাছাকাছি পৌঁছে মন্থর হয়ে গেল হার্স্টের অগ্রগতি।

'সাবধান।' হুঁশিয়ার করল রানাকে কোটিপতি। 'মাথা নিচু করুন। নইলে চোখে পড়ে যাবেন। ওই কাঁটাঝোপের ওপাশে চলে যান আপনি।'

ক্যাকটাসের উপর ছোট্ট একটা উজ্জ্বল হলুদরঙা পাখি বসে আছে, সরু লাল ঠোঁট দিয়ে পিঁপড়ে ধরছে আর টপাটপ গিলছে। রানাকে এগোতে দেখে চকচকে কালো জিজ্ঞাসু চোখে লক্ষ করল ওকে, তারপর চিঁ করে সরু গলায় ডেকে উঠেই উড়ে চলে গেল উপত্যকার দিকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা ক্যাকটাসের আড়ালে। নিচের দিকে চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর।

অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরোল হার্স্টের কণ্ঠ থেকে। নিজের অজান্তেই।

চট করে চোখ সরিয়ে নিল হার্স্ট।

ধস্তাধস্তি করছে লরেলী হার্স্ট মাটিতে শুয়ে। দুই হাতে ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করছে ইটালিয়ান যুবককে বুকের উপর থেকে। খলখল হাসছে যুবক। জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই এক এক করে কাপড় খোলার চেষ্টা করছে সে লরেলীর। কোন তাড়া নেই ওর।

একটা পাহাড়ী ঝর্ণার সরু এক চিলতে পানি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে ওপাশের উপত্যকার। যেখান দিয়ে পানির ধারা গিয়েছে সেখানেই উজ্জ্বল সবুজের সমারোহ। নানান ধরনের গাছ গজিয়ে উঠেছে ঝর্ণার ধার ঘেঁষে—মেসেমব্রায়ানথেমাম, রোজাশিয়া, ক্রুসিফার ছাড়াও রয়েছে থোকা থোকা সুন্দর ঘাসের গুচ্ছ।

নীরবে যুঝছে দু'জন গজ পঁচিশেক দূরে ঝর্ণার ধারে। সাপের মত এঁকেবেঁকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে লরেলী যুবককে। বার দুই পিস্তল উঁচু করে গুলি করতে উদ্যত হলো হার্স্ট, কিন্তু নামিয়ে নিল আবার। দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নাড়ছে সে।

'এখন গুলি করলে লরেলীর গায়ে লাগবে,' বলল চাপা কর্কশ গলায়।

ম্যাগনামের ইয়া প্রকাণ্ড বুলেট দু'জনকেই ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে

যাবে। তাই হার্স্ট না পারছে গুলি করতে, না পারছে চোখের সামনে নিজের মেয়ের সর্বনাশের দৃশ্য সহ্য করতে। চোখ-মুখ কুঁচকে গিয়ে বীভৎস আকার ধারণা করল হার্স্টের। হঠাৎ ভেঙে পড়ল সে। রানার মনে হলো বিশ সেকেন্ডে বিশ বছর বেড়ে গেছে লোকটার বয়স।

'আমি ঘুরে যাই ওদিক দিয়ে!' হার্স্টের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রানা। 'এছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। দুইদিক থেকে কাবু করব আমরা ওকে। লুগারটা দিন।'

তর্ক করল না হার্স্ট। চোখের জ্যোতি মুছে গেছে লোকটার। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে চোখের সামনে নিজের মেয়েকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে। যে কোন বিপদের মুখে বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে যে লোক দ্বিধা করেনি কোনদিন সে লোক হতবুদ্ধি, অসহায় হয়ে গেছে—সমস্ত তৎপরতা অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর মধ্যে থেকে। লুগারটা বের করে দিল পরাজিত ভঙ্গিতে।

দ্রুতপায়ে নেমে গেল রানা বেশ কিছুটা, তারপর বামদিক থেকে ঘুরে চলে গেল ওপাশে। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল সে ধস্তাধস্তিরত জোড়ার সমান উঁচুতে। তারপর ক্রলিং করে এগোল। ছোট ছোট ঝোপ আর বোল্ডারের আড়ালে আড়ালে চলে এল রানা ওদের বিশ গজের মধ্যে। এখানেই থামতে হবে, আর এগোবার কোন উপায় নেই।

যুবকটির দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজে মাথা তুলে ওদিকে চাইল রানা। এখান থেকে গুলি করলে লোকটাকে খতম করে দেয়া যায়, বুঝতে পারল সে। মেয়েটার গায়ে গুলি লাগবে না, সে ব্যাপারেও শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত। কিন্তু তবু ঠাণ্ডা মাথায় এইভাবে একটা লোককে গুলি করতে বাধল ওর। আত্মরক্ষার জন্যে খুন করা এক কথা, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। পিস্তল তাক করে ধরেও ট্রিগারে চাপ দিতে পারল না সে কিছুতেই। নিচু গলায় কি যেন বলল লোকটা, তারপর হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে গেল একটু। ব্যস, গুলি করবার উপায় রইল না আর। এখন গুলি করলে মারা পড়বে মেয়েটাও। আক্ষেপ হলো রানার সুযোগটা নষ্ট করে ফেলার জন্যে, কোমলতা বর্জন করে দ্বিধাহীন চিত্তে গুলি করা উচিত ছিল ওর তখনই।

মেয়েটার একটা পা শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ল আবার মাটিতে। অর্ধনগ্ন করে ফেলেছে লোকটা ওকে।

এমনি সময়ে আর সহ্য করতে না পেরে উঠে দাঁড়াল হার্স্ট।

'কোন ভয় নেই, লরেলী,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ভয় নেই, আসছি আমি!'

কোনরকম আড়াল না নিয়েই তর তর করে নেমে আসছে সে পিস্তল হাতে। হার্স্টের মত একজন পাকা শিকারী এরকম একটা ভুল করে বসবে ভাবতেও পারেনি রানা। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি লোকটার? নাকি রানার দিক থেকেও গুলি করা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে দিশেহারা হয়ে নেমে আসছে?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হ্যাঁচকা টানে

মাটি থেকে লরেলীকে তুলে জড়িয়ে ধরল সামনে। ভোজবাজির মত হাতে চলে এসেছে একটা কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল। পাই করে ঘুরে হার্স্টের দিকে মুখ করে দাঁড়াল লোকটা। পিস্তলের মুখ চেপে ধরা আছে লরেলীর কানের উপর।

'আর এক পা সামনে আসবেন না, সিনর!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ করল লোকটা। 'থেমে দাঁড়ান, নইলে চাপ দেব ট্রিগারে।'

'ড্যাড!' ককিয়ে উঠল অর্ধনগ্ন লরেলী। 'ও ড্যাড···'

পাথরের মূর্তির মত থেমে দাঁড়িয়েছে হার্স্ট। বিচিত্র ভাব খেলে যাচ্ছে ওর রক্তশূন্য মুখের উপর দিয়ে, নিজের অজান্তেই নড়ছে গাল দুটো, ঠোঁট।

'ছেড়ে দাও মেয়েটাকে,' বলল সে একটু সামলে নিয়ে। শান্ত কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেঁপে গেল গলাটা শেষের দিকে। 'ছেড়ে দাও। দূরে সরে দাঁড়াও। টাকা তুমি পাবে।'

হা হা করে হেসে উঠল যুবক। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল সে হাসির। মাথা ঝাঁকিয়ে একরাশ কোঁকড়া অবাধ্য চুল পিছনে সরাল সে।

'টাকা পাব তাতে কোন সন্দেহ নেই, সিনর,' মেয়েটাকে আর একটু চেপে ধরল সে নিজের গায়ের সাথে। 'কিন্তু শুধু টাকাতে যে মন ভরবে না। ডার্লিংকে অর্ধেক দেখেছি আমি, সবটা না দেখে ছাড়ব কি করে?'

ঝট করে সরে গেল পিস্তলটা লরেলীর কানের উপর থেকে। হার্স্টের দিকে তাক করে ধরা সেটা। কড়াৎ করে গর্জে উঠল ওটা একবার। হার্স্টের পায়ের কাছে চল্টা উঠে গেল একটা পাথরের গা থেকে। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল হার্স্ট, পলক পর্যন্ত পড়ল না চোখের।

'পিস্তলটা এবার ফেলে দিন লক্ষ্মী ছেলের মত নইলে দ্বিতীয় গুলিটা ঠিক হাঁটুতে গিয়ে ঢুকবে। আমার দিকে পিস্তল ধরা থাকলে কথাবার্তা বলতে অস্বস্তি লাগে আমার। ফেলে দিন ওটা হাত থেকে।'

আদেশ পালন করবার আগে কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করল হার্স্ট, তারপর ছেড়ে দিল পিস্তলটা হাত থেকে। বিকটদর্শন পিস্তলটা কয়েক হাত নিচে নেমে থেমে গেল একটা পাথরে আটকে।

'ভেরি গুড বয়!' বলল যুবক হাসিমুখে। 'যেখানে আছেন ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। কিংবা ইচ্ছে করলে বসতেও পারেন। খানিক অপেক্ষা করতে হবে। টাকার কথা পরে, আগে যেটার মাঝপথে বাধা দিয়েছেন সেই কাজটা শেষ করে নিই।'

ডান হাতে পিস্তলটা ধরা রয়েছে হার্স্টের দিকে, লরেলীর কাঁধের উপর দাঁত বসিয়ে দিল। তারপর একহাতে ফিরাল লরেলীকে নিজের দিকে।

'পাপাকে দেখিয়ে দাও তো, ডার্লিং, কত বড় হয়ে গেছ তুমি। নাও প্রথমে কিস করো একটা। তারপর···'

হার্স্টের গলা থেকে কান্নার মত একটা বেসুরো শব্দ বেরোল। বুকের উপর চেপে বসে গলায় ছুরি চালালে যে রকম শব্দ হয়, অনেকটা সেরকম।

রানা বুঝতে পারছে, কলজে ফেটে যাওয়ার দশা হয়েছে লোকটার।

হঠাৎ সামান্য একটু পাশ ফিরতেই যুবকের পিস্তল-ধরা হাতটা আলগা পেল রানা। এবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

খুব সাবধানে লোকটার ডান হাতের কব্জি তাক করল রানা। বিশ গজ দূর থেকে এই লক্ষ্য ভেদ করা বন্দুক বা রাইফেলের জন্যে যতটা সহজ, পিস্তলের জন্যে ঠিক ততটাই কঠিন। তার উপর অপরিচিত পিস্তল। ওর ওয়ালথার পি. পি. কে. হলে এতটা অনিশ্চয়তায় ভুগত না সে, এত বেশি সাবধানতার প্রয়োজন হত না ওটা সাথে থাকলে। বাম বাহুর উপর ডান হাতের কব্জি রেখে যত্নের সাথে লক্ষ্যস্থির করল রানা। হ্যাঁচকা টান না দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রিগারের উপর চাপ বাড়াতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গর্জে উঠল লুগার।

কব্জি গুঁড়ো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। ধাক্কার চোটে পুরো একপাক ঘুরে হার্স্টের দিকে ফিরল লোকটা আবার। দুই চোখে ভীতি ও বিস্ময়। কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়েছে ওর পিস্তলটা। সেদিকে চাইল একবার, আবার চাইল নিরস্ত্র হার্স্টের দিকে—গুলি এল কোত্থেকে?

লোকটার হাত থেকে পিস্তল খসে পড়তে দেখেই চাপা হিংস্র একটা গর্জন তুলে ঝাঁপ দিল হার্স্ট নিজের পিস্তলটা তুলে নেয়ার জন্যে।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক দ্রুতবেগে লরেলী তুলে নিল মাটি থেকে কোল্ট অটোমেটিকটা।

'এ কি! না, না! মেরো না!' চিৎকার করে উঠল লোকটা লরেলীর হাতের পিস্তল ওর দিকে ফিরতেই। 'সরাও ওটা, গুলি বেরিয়ে যাবে।'

প্রথমে বিস্ময়, তারপর তীব্র আতঙ্ক দেখতে পেল রানা লোকটার মুখে। লরেলীর ফর্সা আঙুল চেপে বসল কোল্টের ট্রিগারে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠল লোকটা কেবল, আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না। পর পর চারবার গর্জে উঠল কোল্ট। প্রতিবারই প্রবল ঝাঁকুনি খেলো লোকটার শরীর। বাঁকা হয়ে গেল পিছন দিকে। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে রেখেছে মিনতির ভঙ্গিতে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল শরীরটা একপাশে। কুঁকড়ে গেছে হাত-পা।

রাগ ও ভয়ের অদ্ভুত এক মিশ্রণ দেখতে পেল রানা মেয়েটার মুখে। আরও দুটো গুলি করল সে। তারপর হাত থেকে খসে পড়ে গেল পিস্তলটা।

দরদর রক্ত ঝরছে লোকটার সর্বাঙ্গ থেকে। সেজদার ভঙ্গিতে ছিল, মোনাজাতের ভঙ্গিতে উঠে বসল—তারপর ধড়াস করে মাটিতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করল যুবক। রক্তের কয়েকটা ধারা ছুটে যাচ্ছে সরু ঝর্ণাধারার সাথে মিলিত হতে।

এতক্ষণ যেন কি এক ঘোরের মধ্যে ছিল, হঠাৎ প্রবল ভাবে শিউরে উঠল লরেলী, কি ঘটে গেছে যেন উপলব্ধি করতে পারল ও এই প্রথম, প্রচণ্ড এক আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল ওর মুখে, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাপের বুকের উপর, দুই হাতে জড়িয়ে ধরল তার গলা।

'ড্যাড!' কেঁদে ফেলল লরেলী হুহু করে। 'ও ড্যাড, আমি ওকে...'

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল হার্স্ট।

'ভুলে যা। ওসব কিচ্ছু ভাবিসনে তুই। ভুলে যা। ওদিকে তাকাবারও দরকার নেই। সরে আয় এদিকে।'

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে লরেলীর মাথার উপর দিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল কোটিপতি ওর দিকে।

'ধন্যবাদ,' বলল হার্স্ট। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা। তুমি...'

আজই সকালের একটা কথা মনে পড়ল রানার। ঠিক এই ধরনেরই কয়েকটা কথা বেরিয়েছিল আজ সকালে ওর নিজের মুখ থেকে।

'ও কিছুই নয়,' বলল সে মৃদু হেসে। 'গ্ল্যাড টু হেল্প।'

এগারো

হাজার হোক, বয়স কম—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কান্না ভুলে গেল লরেলী হার্স্ট। ফেরার পথে রানা ও তার বাবাকে শোনাচ্ছে সে প্রফেসার ফেরেনসির গুহামুখের কাছে কি ঘটেছিল।

'আমি একটু দূরে সরে পড়েছিলাম। প্রফেসার এদিকে কয়েকটা জিনিস আনবার জন্যে ঢুকতে যাচ্ছিল তার গুহার ভিতর। এমনি সময় গুড়ুম গুড়ুম গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। সে কি তুমুল গোলাগুলি!'

'তুমি তখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল হার্স্ট।

'পাইন জঙ্গলের পাশে যে পাহাড়টা আছে, আমি তখন ওটায় উঠছিলাম। চোখের সামনে দেখলাম গুলি খেয়ে পড়ে গেল রাটল্যান্ড। ওকে পড়ে যেতে দেখে পিস্তল বের করে গুলি করতে আরম্ভ করল প্রফেসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেইগ। একটু পরে দেখি সে-ও পড়ে গেছে...'

'আর প্রফেসার ফেরেনসি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তিনি তো একছুটে ঢুকে গেলেন গুহার ভেতর। তারপর তার কি হয়েছে আর জানি না।' ঘটনাটা স্পষ্ট মনের পর্দায় ভেসে ওঠায় একবার শিউরে উঠল লরেলী, তারপর বলল, 'আমি বোধহয় ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কিংবা ওই রকম কিছু, কারণ হঠাৎ দুইজন দু'দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।' দুই হাত চিৎ করল লরেলী, 'তারপরের ঘটনা তো তোমরা জানোই।'

'প্রফেসারকে গুহায় ঢুকতে দেখেছ তুমি, তার কপালে কি ঘটেছে জানা নেই তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বললাম তো,' বলল লরেলী। 'দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়তে দেখেছি, কিন্তু তার পরের ঘটনা আর আমার জানা নেই। পালিয়েছে, না ধরা পড়েছে, না মরেছে, জানি না।'

'এখন ওকে কারও খবরের জন্যে চাপাচাপি কোরো না, রানা,' বলল

হার্স্ট একটু কড়া গলায়। পরমুহূর্তে স্বরটা একটু নরম করে বলল, 'ওর মনের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছ।'

হাঁটছে ওরা চুপচাপ। নানান প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল রানার মনে। আচমকা এই ঘটনার কি কারণ? ফেরেনসির উপর মাফিয়ার আক্রমণ? লরেলীকে ভাগ্যক্রমে পেয়ে গিয়ে কিছু বাড়তি মুনাফার ব্যবস্থা হয়েছিল? নাকি ব্যাপারটা গুপ্তঘাতকের দ্বিতীয় আক্রমণ?

না, সেটা সম্ভব নয়। সম্ভাব্য হত্যাকারীর দু'জনেই এই ঘটনার সময় ছিল ওর সাথে। তাছাড়া হার্স্ট যদি হত্যাকারী হয় কোন অবস্থাতেই সে তার মেয়েকে জড়াবে না এসবের মধ্যে। এই ব্যাপারটার সাথে গুপ্তঘাতকের ব্যাপারটা না জড়ানোই ভাল। এটা খুব সম্ভব সম্পূর্ণ আলাদা কোন ঘটনা।

তাহলে কি দাঁড়াল? মাফিয়া। ফেরেনসির সাথে হয়তো টাকার গোলমাল হচ্ছিল, তাকে একটু শায়েস্তা করতে গিয়ে হাতে পেয়ে গিয়েছে হেনরী হার্স্টের মেয়েকে। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

মনে মনে রানা জানে, এছাড়াও আরও অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু আপাতত এর বেশি দেখতে পাচ্ছে না সে। এর বেশি কোন তথ্য ওর হাতে নেই। কিন্তু পরিষ্কার টের পাচ্ছে মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেছে কোথায় যেন। এ নিয়ে আরও অনেক ভাবতে হবে ওকে। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হবে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার। জানতেই হবে ওকে, রাটল্যান্ডের রিভলভার থেকে গুলি সরিয়ে খালি খোল পুরে দিয়েছিল কে, কেন, কি উদ্দেশ্যে।

'পুলিসকে কি বলব?' পাইন জঙ্গলের এপাশের আপেল বাগানে ঢুকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল হার্স্ট।

'পুলিস!' একটু যেন অবাক হয়ে গেল রানা প্রশ্নটা শুনে।

'হ্যাঁ, পুলিস। ওদের কি বলব? ঝর্ণার পাশের লাশটার কথা ছেড়েও যদি দেই, রাটল্যান্ডের লাশের ব্যাপারে, আর ড্রেক না কি নাম ওই প্রফেসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে আমাদের। বুলেটের জখম নিয়ে হাসপাতালে গেছে লোকটা, পুলিস ইনকোয়েরী হবেই। কি বলব আমরা?'

'পুলিসের কাছে সব সময় সত্যি কথাটা বলাই ভাল,' সহজ গলায় বলল রানা। 'আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আপনি পিছু ধাওয়া করে উদ্ধার করে এনেছেন। ব্যস। এতেই চলবে, আর কিছু বলবার দরকার পড়বে না।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু খবরের কাগজে উঠবে খবরটা। চিন্তা ওখানেই। মাফিয়ার কথা ভাবছি—ওদের একজন লোক মেরে ফেলেছি আমরা।'

একজন নয়, তিনজন—মনে মনে বলল রানা। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন হার্স্টকে কিছু না বলাই ভাল বিবেচনা করে চুপ করে থাকল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইল হার্স্ট।

'সব ঘটনা কাগজে ছাপা হলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে খেপে উঠবে না মাফিয়া?'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'আমি যতদূর জানি, মাফিয়া হচ্ছে

যাকে বলে পুরোপুরি প্রফেশনাল দস্যুদল। লাভ ছাড়া এক পা-ও ফেলবে না ওরা কোন দিকে। প্রতিশোধে কোন প্রফিট মার্জিন নেই। উঁহুঁ। আমার মনে হয় না প্রতিশোধের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে ওরা। অবশ্য খুব নিকট আত্মীয়স্বজনের কথা আলাদা। এ ব্যাপারে প্রফেসার ফেরেনসি বলতে পারবেন। ওঁর তো চেনাজানা আছে ওদের সাথে।'

'চেনাজানার ফলে ওকে খুব একটা খাতির করেছে বলে তো মনে হয় না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লরেলী।

'থাক, থাক,' বাধা দিল হার্স্ট। 'এ ব্যাপারে এখন আর কোন আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। আলাপ আলোচনার জন্যে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে পরে।'

আশ্চর্য সহযোগিতা পাওয়া গেল পালারমো পুলিসের কাছ থেকে। অবশ্য এটা যে পালারমো পুলিসের বৈশিষ্ট্য, তা মনে হলো না রানার। কেন যেন পুঁজিবাদী পৃথিবীর সবখানেই কোটিপতিদের সাহায্য ও সহযোগিতা দানের ব্যাপারে পুলিসের কার্পণ্য নেই। ঘুষ বা বকশিশের লোভে যে এটা ঘটে তা নয়, ওরা ধরেই নেয় বিত্তহীনের জ্বালাতন থেকে বিত্তবানকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ওদের। কোটিপতির সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করা স্বাভাবিক কর্তব্য বলে ধরে নেয় ওরা।

ফেরেনসির গুহার বাইরে ডক্টর জ্যাকোপোর সাথে বসে গল্প করছিল পুলিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ওরা যে দয়া করে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেল অফিসার। দশ মিনিটের মধ্যেই স্টেটমেন্ট লিখে দিয়ে ছাড়া পেয়ে গেল ওরা। জেটিতে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন নেই জেনে জীপে উঠে চলে গেল অফিসার তার সেপাই ও সাব-ইন্সপেক্টরকে নিয়ে।

'চলো, হাসপাতালটা একবার ঘুরে দেখে যাই,' বলল জ্যাকোপো। 'জ্যাক থাকলে তুলে নেয়া যাবে ওকে, আর ক্রেইগের অবস্থাটাও জেনে যাওয়া যাবে।'

হাসপাতালে জানা গেল জন ক্রেইগের অবস্থা খুবই গুরুতর, জ্ঞান ফেরেনি এখনও, ব্লাড ট্র্যান্সফিউশন চলছে। জ্যাক ডেলের খবর জিজ্ঞেস করায় একজন সুন্দরী নার্স জানাল যে ব্লাড ব্যাংকে ক্রেইগের ব্লাডগ্রুপের রক্ত না থাকায় দুই বোতল ব্লাড ডোনেট করে কাহিল হয়ে ফিরে গেছে সে ইয়টে।

ইয়টে ফিরতেই দেখা গেল অতিথিদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা। ভিড় করে ঘিরে ধরল ওরা এদের। মেয়েরা প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল লরেলীকে; পুরুষরা ঘিরে ধরল রানা ও হার্স্টকে। মোটামুটি কাঠামোটা জানা হয়ে গিয়েছিল ওদের জ্যাক ডেলের কাছ থেকে আগেই, এবার কিভাবে কি হলো বিস্তারিত জানতে চায় ওরা। রানা বুঝতে পারল, এই ব্যাপারে এদের এত উৎসাহের কারণ হার্স্টের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা নয়, এরা প্রত্যেকেই কোটিপতি, কিডন্যাপের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওদের প্রত্যেকের

জীবনেই, এরা জানতে চায় আরেকজন কোটিপতি ঠিক কিভাবে বেরিয়ে এল এই দুঃস্বপ্নকে পরাজিত করে। কিন্তু হতাশ করল ওদের হার্স্ট।

'এখন না, এখন না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল সে। 'পরে। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা এখন। ডিনারের সময় বিস্তারিত শুনতে পাবে সবাই।' রানার দিকে ফিরল সে। 'রানা, আমার স্টেটরুমে যদি কয়েক মিনিটের জন্যে আসতে পারো তো বড় ভাল হয়।'

স্টেটরুমে রানা পৌঁছতেই দুই গ্লাস শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল হেনরী হার্স্ট, স্টুয়ার্ড বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকে ফিরল রানার দিকে।

'মাসুদ,' রানাকে সিগারেট ধরাবার অবসর দিয়ে শুরু করল হার্স্ট। 'ভয়ানক একটা দিন গেল আজ, তাই না? একেবারে আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছিল আমার।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'না চাইতেই তুমি যে সহজভাবে বাড়িয়ে দিয়েছ সাহায্যের হাত, তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। কিন্তু তোমার কাজ দেখে তারিফ না করে থাকতে পারছি না। পিস্তলেও দেখছি তোমার দারুণ হাত!'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর উপর আপাদমস্তক নজর বুলাতে দেখেই চট করে বুঝে ফেলল রানা এবার কি আসছে।

'রাটল্যান্ড মারা গেছে,' বলেই চলল কোটিপতি। 'ওকে অবশ্য পৃথিবীর সেরা বডিগার্ড বলা যায় না, কিন্তু অনেকের চাইতে যে ও অনেক ভাল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর মত আরেক জনকে খুঁজে পাওয়া মুখের কথা নয়। লরেলীটা হচ্ছে আবার পাজীর পা ঝাড়া। ওর ওপর নজর রাখাও চাট্টিখানি কথা নয়।' একঘেয়ে কণ্ঠে এতগুলো কথা বলে হঠাৎ আসল কথায় চলে এল হার্স্ট। 'যে ক'দিন উপযুক্ত লোক না পাচ্ছি, সে ক'দিনের জন্যে তুমি নেবে কাজটা? কিছু না, শুধু ওর ওপর নজর রাখা আর ওকে বিপদমুক্ত রাখা।'

রানা ঝট করে কোন উত্তর দিয়ে বসবার আগেই যুক্তি খাড়া করে ফেলল হার্স্ট চট করে।

'ক্যামেরাম্যান হিসেবে ঠিক কত রোজগার করো আমি জানি না। বেশ ভালই হওয়ার কথা। সেটা যাই হোক, আমি তার তিনগুণ দেব। ঠেকায় পড়ে এই ধরনের কাজ যে করোনি, তা তো নয়, মাসুদ। এখন তোমার ঠেকা নেই, না হয় আমার খাতিরেই করলে কাজটা কিছুদিন? মাসের শেষে সাদা চেক সই করে পাঠিয়ে দেব, তোমার ইচ্ছেমত টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিয়ো তাতে। বিনিময়ে শুধু আমার বাচ্চাটাকে একটু দেখো।'

লোকটার জন্যে মায়া হলো রানার। কোটিপতি, স্পোর্টস্ম্যান, মানুষের যা যা চাওয়ার প্রায় সবই তার হাতের মুঠোয়—অথচ আশ্চর্য এক উৎকণ্ঠিত জীবন যাপন করছে লোকটা মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে। পাজী মেয়ের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারছে না কিছুতেই।

যাকে গুপ্তঘাতক সন্দেহ করে হত্যা করবার জন্য ধাওয়া করে এসেছে রানা সুদূর বাংলাদেশ থেকে, সেই ওর হাতে তুলে দিচ্ছে তার একমাত্র সন্তান লরেলীর নিরাপত্তার ভার। এর মানে কি হার্স্ট গুপ্তঘাতক নয়?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হার্স্ট যদি গুপ্তঘাতক হয়েও থাকে, রানার আসল পরিচয় জানা নেই তার। ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে রানার উদ্দেশ্য।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেল প্রফেসার ফেরেনসি। কপালে প্লাস্টার লাগানো। গম্ভীর মুখে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তার বক্তব্যের মধ্যে ঘাই-ঘাপলা কিছুই খুঁজে পেল না রানা। একেবারে পরিষ্কার।

'হঠাৎ আচমকা শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। ছুটে এসে কপালে লাগল কি যেন। দিশেমিশে না পেয়ে আমিও ছুট দিলাম সোজা অন্ধকার গুহার ভেতর। যদি তাড়া করত, গলিঘুঁচির মধ্যে আমাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হত না কারও পক্ষে।'

'তার মানে আপনি সবাইকে ফেলে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জ্যাক ডেল। 'লরেলীকে রক্ষা করার কথা নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল না তখন?'

'ছিল, মিস্টার ডেল,' একগাল হেসে অমায়িক ভঙ্গিতে বলল প্রফেসার। 'উনি ঘটনার সময় কাছাকাছি কোথাও ছিলেন না। কিন্তু যদি থাকতেন, তাহলেই বা আমি কি করতে পারতাম, বলুন? আমি শান্তিপ্রিয় লোক। অস্ত্র বলতে একখানা জিওলজিক্যাল হ্যামার। এটা দিয়ে তো আর পিস্তলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তবে যদি পিছু ধাওয়া করে ভেতরে ঢুকত, তাহলে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতাম ওদের তাতেও কোন সন্দেহ নেই। শত্রুকে কাছাকাছি পেলে প্রমাণ করে দিতাম আমার ছোট্ট হাতুড়িটাও কোন কোন সময় দারুণ এক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।'

বিরক্তি চাপতে না পেরে ঝট করে পিছন ফিরল জ্যাক ডেল। এবার আক্রমণ ভাগে এল ডক্টর জ্যাকোপো।

'কিন্তু, জর্জিয়ো, তোমার তো ইয়ট ছেড়ে ঘাটে যাওয়ার কথা ছিল না? এই ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে তোমাকে কি বলেছিলাম আমি আজ সকাল বেলা? সোজা বিছানায় গিয়ে ঢুকতে বলেছিলাম না?'

'তা ঠিক,' লজ্জিত হাসি হাসল প্রফেসার। 'বলেছিলেন। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই চাঙা হয়ে উঠলাম। মিস লরেলী যখন কয়েকটা নমুনা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তার ওপর যখন জানতে পারলাম যে এ ব্যাপারে ওঁর বাবার খুবই উৎসাহ আছে, তখন চট করে একবার গুহা থেকে ঘুরে আসায় কোন দোষ দেখতে পাইনি আমি। ওখানে কি ঘটতে চলেছে আগে থেকে জানা থাকলে যেতাম না নিশ্চয়ই কিছুতেই।'

প্রফেসারের বক্তব্য শুনে বুঝল রানা প্রথমে যেমন শুনেছিল, আসল ঘটনা তার থেকে একটু ভিন্ন। আগে শুনেছিল প্রফেসার ফেরেনসি পারে গিয়েছিল নিজের ইচ্ছায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। হার্স্টের আনন্দবর্ধনের জন্যে কিছু নমুনা আনতে গিয়েছিল সে। তাহলে কি তার পারে যাওয়ার পিছনে হার্স্টের অলক্ষ্য হাত ছিল? সে কি আশা করেনি যে তার

মেয়েও বোকার মত রওনা হয়ে যাবে ফেরেনসির সাথে? তাই কি অতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল লরেলীর পারে যাওয়ার সংবাদে? মাফিয়ার আক্রমণের ব্যাপারটা কি আগে থেকে সাজানো? কিন্তু সেক্ষেত্রে তারই মেয়েকে ধরবে কেন মাফিয়া? উদ্ধারপর্বটা যে সাজানো নয়, সে ব্যাপারে রানা সুনিশ্চিত। বড় গোলমেলে হয়ে উঠছে ব্যাপারটা ক্রমে। সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে রাটল্যান্ডের রিভলভারটা। গুলিগুলো যে সরিয়েছে সে জানত আক্রমণ হবে আজ ফেরেনসির গুহার কাছে। আক্রমণটা যেন এক তরফা হয়, অর্থাৎ রাটল্যান্ড যেন গুলি ছুঁড়তে না পারে তার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল আগে থেকে।

কে সে?

তাছাড়া প্রফেসার ফেরেনসি এই ইয়টে ফিরে এল কি চিন্তা করে? প্রথমে গুহার মধ্যে ঘটল বিস্ফোরণ, তারপর এই অতর্কিত আক্রমণ—সে বুঝতে পেরেছে এসব ওকেই হত্যার প্রচেষ্টা? টের পেয়েছে মৃত্যু ডাকছে ওকে হাতছানি দিয়ে? দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে একেবারে?

না বুঝতে পারার মত বোকা লোক নয় জর্জিয়ো ফেরেনসি।

তাই কি ইয়টের নিরাপত্তায় ফিরে এসেছে সে? মনে করছে বেঁচে গেল এ যাত্রা? গুপ্তঘাতকের আস্তানায় ঢুকে পড়ছে ফেরেনসি নিজেরই অজান্তে? নাকি জানে সে?

বারো

রাতে ভাল ঘুম হলো না ফেরেনসির জ্বালায়। কম করে হলেও আট থেকে দশবার দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে লোকটা—রেডিও রিসিভারের তীক্ষ্ণ শিস শুনে লাফিয়ে উঠে বসেছে রানা। কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে বাইরে থেকে কোন আক্রমণ আসেনি, স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে উঠেছে লোকটা।

ফেরেনসির আতঙ্কের পরিমাণ টের পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। অন্ধকার কেবিনের মধ্যে জেগে উঠে যখন বুঝতে পারছে এতক্ষণ যা ঘটেছিল সেসব সত্যি নয়, স্বপ্ন, তখন হাঁপ ছাড়ছে সশব্দে। লোকটার কষ্ট দেখে তার প্রতি কৃপা বোধ করল রানা। কী জীবন!

'না না! আমি না···উহ্!' চেঁচিয়ে উঠছে ফেরেনসি। মাঝে মাঝে ককিয়ে উঠছে, 'বাঁচাও! ও ঈশ্বর!···ভুল লোককে ধরেছ তোমরা, ঈশ্বরের কিরে কেটে বলছি, আমি না!···না, ছুরি না,···ছুরি না···ঈশ্বর···'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। এর জন্যে কিছুই করবার নেই ওর। কুড়োল মেরেছে লোকটা নিজের পায়ে। দুই তরফ থেকে টাকা খেয়েই সর্বনাশ করেছে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাছে ও এখন একটা শিকার ধরবার টোপ ছাড়া কিছুই না। কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে লোকটা,

চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে রানাকে, কোনরকম সাহায্য করবার উপায় নেই।

সকালের দিকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা, ভেবেছিল বেলা করে উঠবে, কিন্তু ইয়টের দুটো পাঁচশো হর্স পাওয়ার ডিজেল ইঞ্জিনকে একসাথে গর্জে উঠতে শুনে আবার একলাফে উঠে বসল বিছানায়। কান খাড়া করতেই নোঙর তোলার শব্দ শুনতে পেল সে। ব্যাপার কি জানবার জন্য ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ডেকে উঠে এল।

'পালারমো ছেড়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হচ্ছে,' রানাকে দেখে বলল হেনরী হার্স্ট। 'মাফিয়া যদি প্রতিশোধের কথা ভাবে তাহলে সেটা কার্যকরী করবার আগেই সরে পড়া উচিত। কি বলো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কোন্ দিকে চলেছি আমরা?'

'এই বিশাল পৃথিবীর তিন ভাগ পানি,' হাত নেড়ে সমুদ্রের দিকে ইঙ্গিত করল হার্স্ট। 'গেলেই হলো একদিকে। পৃথিবীর যেখানেই বারো ফুট পানি আছে, সেখানেই গিয়ে হাজির হতে পারে ইয়ট সোফিয়া।'

গলুইয়ের কাছ থেকে একজন ইঙ্গিত করল, পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে নোঙর। হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল হার্স্ট, একটা লিভার টেনে দিয়ে যন্ত্রপাতির প্যানেলের দিকে ইশারা করে বলল, 'হাইড্রলিক্স! কারও সাহায্য ছাড়াই এখান থেকে চালানো যায় ইয়ট।'

হুইল ঘুরিয়ে দিল হার্স্ট পাকা হাতে। ইয়টের নাকটা ফিরল সমুদ্রের দিকে। বুক ভরে একবার শ্বাস নিয়ে খুশি হয়ে উঠল হেনরী হার্স্ট।

'ভাবছি লিপারি দ্বীপের দিকে রওনা হওয়া যাক,' বলল সে। 'ইচ্ছে হলে স্ট্রম্বোলির আগ্নেয়গিরিটাও দেখে নেয়া যাবে এক নজর। ওই দ্বীপগুলোর ওদিকে ভাল মাছ পাওয়া যাবে, ইচ্ছে করলে শিকারও করা যায়।'

বন্দর থেকে বেশ কিছুটা সরে এসেই পাল তোলার হুকুম দিল হার্স্ট। ডাঙার দিক থেকে চমৎকার হাওয়া বইছে। কয়েকজন ক্রু ব্যস্ত হয়ে গেল পাল তোলার কাজে। আবার রানার দিকে ফিরল হার্স্ট।

'ইঞ্জিন ঠিকই আছে,' বলল সে। 'ডিজেলেরও কোন অভাব নেই। কিন্তু আসল কথা, বাতাস তৈরি করছে ঈশ্বর ব্যবহারের জন্যে। পাল টাঙাতে যখন জানি তখন খামোকা তেল পোড়াতে যাব কেন? তাছাড়া ইয়টের সৌন্দর্যই হচ্ছে তার পাল। তুমি কি বলো?'

কথাটা মনে মনে স্বীকার না করে পারল না রানা। লম্বা উঁচু মাস্তুলে যখন তিনকোনা পালগুলো টাঙানো হলো তখন চেহারাটাই পাল্টে গেল ইয়টের। ভোরের রোদ লেগে কমলা রঙের ডেক্রনের পালগুলো ঝিকমিক করে হেসে উঠল যেন। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে হার্স্ট আগেই। বাতাসের ঠেলায় ফুলে উঠল পাল, পালের টানে সামান্য একটু কাৎ হয়ে গেল ইয়ট।

'চালাবে?' হুইলের দিকে ইশারা করল হার্স্ট রানাকে ভুরু নাচিয়ে।

'নাহ্,' বলল রানা। 'ঘন্টাখানেক গড়াগড়ি করে আসি বিছানায়। ভাল ঘুম

হয়নি রাতে।'

'অপূর্ব! তাই না?' চলে যাচ্ছিল রানা, হার্স্টকে মুগ্ধ কণ্ঠে কথা বলে উঠতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টি রাখল ওর মুখের উপর। প্রায় আপন মনে কথা বলছে হার্স্ট। 'জীবন! এটাই জীবন! কি আছে নগরে, বন্দরে?'

এই প্রথম লোকটাকে সুখী মনে হলো রানার। প্রকৃতি-পূজারী এক সুখী পুরুষ।

যদিও এ সুখ বেশিক্ষণের নয়, জানে সে।

গগলস আঁটা কটুভাষিণীর কবল থেকে রানাকে উদ্ধার করল লরেলী হার্স্ট। অনায়াস দক্ষতায় স্থাপন করল সহজ সখ্য। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনার বন্যা আছে মেয়েটার মধ্যে। যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভাসিয়ে ডুবিয়ে একাকার করে দেয় তাকে।

হাসি গল্পে বেশ মাতিয়ে রেখেছিল বিকেলটা, বাবাকে লুকিয়ে একটার পর একটা খেয়ে চলেছিল রানার সিগারেট, আর রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়ে দেখছিল সাগর জলে ডলফিনের খেলা—হঠাৎ রানার মুখে ইয়ট লিপারির দিকে চলেছে শুনে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল লরেলী।

'সত্যি? আমি তো মনে করেছি টাওরমিনার দিকে চলেছে বুঝি। দাঁড়াও ড্যাডকে খানিক বকে দিয়ে আসি।'

গটমট করে হেঁটে গিয়ে ব্রিজ খেলায় রত পিতার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল লরেলী।

'ড্যাড! আবার তুমি যেদিকে খুশি সেদিকে চলেছ? কী আছে ওইসব পচা দ্বীপে? শিকারের নেশায় ভুলেই গেছ যে টাওরমিনায় যাবে বলে কথা দিয়েছ তুমি!'

'আরে! তাই নাকি?' আকাশ থেকে পড়ল হেনরী হার্স্ট, 'কথা দিয়েছি? কাকে?'

'কেন, মনে নেই? ভেনিসে আলাপ করিয়ে দিলাম না তোমার সাথে—হলিউডের ট্রুপ, "হরিব্‌ল্ হান্ট" বলে একটা ছবি করছে। ওদের সাথে টাওরমিনায় দেখা করবে বলে কথা দিলে না তুমি? তোমারই এক বন্ধুর বাগান বাড়িতে শার্ক সিকোয়েন্স শূট করার কথা···কিছু মনে নেই তোমার! বেশ লোক তো!'

বাচ্চা ছেলের মত লজ্জিত হাসি হাসল হার্স্ট। একটু আঁইগুঁই করে বলল, 'কথা দিয়েছি, লরেলী? ঠিক? মানে, যদি ভুলে যাই ক্ষতি কি?'

'আচ্ছা মানুষ তো! ভুলে গেলে ক্ষতি কি! রিচার্ড বার্টন আর এলিজাবেথ টেলার! বলছ কি তুমি? কি মজা হবে টাওরমিনার শূটিং-এ তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ড্যাড। এটা মিস করলে দুঃখ থেকে যাবে সারা জীবন।'

আবার সিসিলিতে ফেরার কথা ভাবতেই পঞ্চাশ ভাগ সুখ উড়ে গেল হার্স্টের চেহারা থেকে।

'ঠিক আছে,' পাংশু মুখে বলল সে। উঠে দাঁড়াল। 'তোমার ভাল লাগলে চলো ওদিকেই যাওয়া যাক।'

মনিবের হুকুম পেয়ে দিক পরিবর্তন করল সোফিয়া। উত্তর-পুবে যাচ্ছিল, মোড় নিল দক্ষিণ-পুবে। বেশ খানিকটা কাত হয়ে গেল ইয়ট, তারপর ক্রমে সোজা হয়ে গেল আবার।

প্রফেসার ফেরেনসির দিকে নজর রেখেছিল রানা। দেখল, দিক পরিবর্তনের আভাস পেয়েই কেমন একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারাটা। চমকে চাইল চারপাশে, গলায় প্যাঁচানো কম্ফোর্টারটা খুলে কান ঢেকে জড়াল আবার। এই আর এক ব্যক্তি, সিসিলিতে ফিরে যাওয়াটা যার ভাল লাগছে না মোটেই। পরিষ্কার জানে লোকটা, সেখানে বিপদ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। শুধু জানে না, এখানে, এই ইয়টেও বিন্দুমাত্র নিরাপদ নয় সে।

গতি পরিবর্তনের সব ব্যবস্থা করে লরেলীকে খুঁজে বের করল হার্স্ট রানার পাশে রেলিঙের ধারে।

'তাই বলে যখন তখন ইচ্ছেমত পারে যেতে পারবে না তুমি!' চোখ পাকাল সে লরেলীর প্রতি।

'দ্যাখো, ড্যাড, কাল রাতে বললে না তুমি মিস্টার মাসুদ রানা রাজি হয়েছেন আমাকে পাহারা দিতে? কাজে যোগ দেয়ার আগেই ভদ্রলোক প্রমাণ করেছেন নিজের যোগ্যতা। এর পরেও আবার ভয় পাওয়ার কি আছে?' রানার দিক চেয়ে ঝকঝকে হাসি হাসল লরেলী। 'আপনি কি বলেন? আছে কোন ভয়?'

প্রফেসার ফেরেনসিকে এইদিকে আসতে দেখে রানা বলল, 'প্রফেসার কি বলেন শোনা যাক। উনিই আমাদের মাফিয়া স্পেশালিস্ট।'

'আমার মনে হয়,' প্রফেসারী ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফেরেনসি, 'ভয়ের কোন কারণ নেই। মাফিয়া কোনদিন প্রতিশোধের ধার ধারে না। আর্থিক লাভ ছাড়া এক পা ফেলে না ওরা কোনদিকে। নইলে আমিই কি সাহস পেতাম? নোঙর ফেলার সাথে সাথে পারে যেতে হবে আমাকে। কয়েকটা টেলিফোন করতে হবে কয়েক জায়গায়। ক্রেইগের খবর নিতে হবে, খোঁড়ার কাজের ব্যাপারে কিছু একটা বন্দোবস্ত করতে হবে...'

'ইচ্ছে করলে এখান থেকেও ফোন করতে পারেন,' বলল হার্স্ট। 'ইয়টে সে ব্যবস্থা আছে।'

'তাই নাকি? ভেরি গুড! খুব সুবিধে হবে তাহলে। এখানে বসেই পালারমোর সব খবর জানা যাবে। অবশ্য তবু টাওরমিনায় নামব আমি অল্পক্ষণের জন্যে। ওখানকার একটা গির্জায় কিছু কাজ করেছিলাম আমি বছর কয়েক আগে, কতদূর এগোল ওরা দেখতে যাব একবার। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সেরাপিসের মন্দিরের ভগ্নাবশেষের ওপর তৈরি হচ্ছিল গির্জাটা। দারুণ ব্যাপার!'

ফেরেনসির কথা থেকে রানা বুঝল, ভেবে চিন্তে একটা পথ বের করেছে সে। হয়তো বুঝতে পেরেছে কারা আক্রমণ চালাচ্ছে ওর উপর, একটা আপস মীমাংসায় আসতে চায় তাদের সাথে। পারে নামা ফেরেনসির জন্যে খুবই প্রয়োজন।

কিন্তু সেক্ষেত্রে মহা সমস্যায় পড়ে যাবে রানা। যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারীকে পরিষ্কার ভাবে চেনা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওর চোখে চোখে রাখা দরকার ফেরেনসিকে। অথচ এদিকে লরেলীকেও গার্ড দিতে হবে ওর। একই সাথে দুই জায়গায় থাকবে কি করে সে?

অনেক রাতে নিজের কেবিনে ঢুকল রানা। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

অন্ধকার ঘর, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সে ঘরে অন্য কারও উপস্থিতি। চট করে একপাশে সরে গেল সম্ভাব্য ছোরা বা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিতে। হাতে বেরিয়ে এসেছে হার্স্টের দেয়া সেই লুগারটা।

একটা খিল খিল হাসির শব্দ কানে গেল রানার, তারপর ক্লিক শব্দ হলো বেডসুইচে। জ্বলে উঠল উজ্জ্বল বাতিটা। খাটের উপর নড়ে উঠল কি যেন।

আলোটা সহ্য হয়ে এল বার কয়েক চোখ মিটমিট করতেই। ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। বুক পর্যন্ত গোলাপী চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে লরেলী ওর খাটে।

'ভয় নেই!' বলল লরেলী। 'এটা তোমারই কেবিন! ভুল করে আমারটায় ঢুকে পড়োনি।' হাসল ও।

ক্লিক করে শব্দ হলো। নিভে গেল বাতি।

টক্, টক্, টক্।

কেবিনের দরজায় মৃদু টোকা। সেকেন্ড দশেক চুপচাপ। তারপর খুট করে খুলে গেল বল্টু।

'কি ব্যাপার, ডাক্তার? আপনি! এত রাতে?'

'হ্যাঁ। আপনার বন্ধু মাসুদ রানা সম্পর্কে আমি দুয়েকটা কথা জানতে চাই। ভেতরে আসতে পারি?'

'তা আসুন,' দরজাটা দু'পাট খুলে দিল জ্যাক ডেল। 'কিন্তু এত রাতে? রানা সম্পর্কে কি এমন জরুরী কথা জানবার প্রয়োজন পড়ল, ডাক্তার?'

'ব্যাপারটা খুব জরুরী না হলে এত রাতে কষ্ট দিতাম না আপনাকে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ডক্টর জ্যাকোপো। 'ভাবলাম, হেনরীর কাছে রিপোর্ট করবার আগে আপনার সাথে আমার আলাপ করা উচিত। কে লোকটা?'

'কে লোকটা মানে?' একেবারে আকাশ থেকে পড়ল জ্যাক ডেল। গোঁফে তা দিয়ে কটমট করে দেখল ডাক্তারকে আপাদমস্তক। 'আমার যতদূর মনে পড়ে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমি রানার। আপনার এই উদ্ভট প্রশ্নের উদ্দেশ্য খুলে না বললে আমি আমার বন্ধু সম্পর্কে আর একটি

কথাও আলাপ করব না আপনার সাথে। প্রশ্নের ধরনটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'অপছন্দ হওয়ারই কথা,' মৃদু হাসল ডাক্তার। 'কিন্তু আমি যা জানি সেটা জানলে এতটা খারাপ লাগবে না। কাজেই আগে কয়েকটা ব্যাপারে আপনাকে জ্ঞান দান করা যাক। আপনার জানা আছে যে আপনার নিরীহ ক্যামেরাম্যান বন্ধু আজ নিজ হাতে ছুরি মেরে খুন করেছে একজন ইটালিয়ানকে? কণ্ঠনালীতে জাপানী কায়দায় লাথি মেরে খুন করেছে তার ভাইকে? আরেকজনকে তাড়া করেছিল ছুরি হাতে, ঘোড়ার লাথি খেয়ে মারা গেছে সে-ও?'

'বুঝতে পারছি, আজও মাত্রা ঠিক রাখতে পারেননি,' সমঝদারের হাসি হাসল জ্যাক ডেল। 'ঠিক হয়ে যাবে। নিজের কেবিনে ফিরে গিয়ে একটা ঘুম দিলেই...'

'বোকার মত যা খুশি ভেবে নেবেন না, মিস্টার ডেল। সব কথা আপনার জানা নেই। যেমন, আপনি জানেন না যে এই মুহূর্তে দশ নম্বর কেবিনে আপনার বন্ধুর পাশে তাকে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে আছে আপনার আর এক বন্ধুর কন্যা লরেলী হার্স্ট। মদ খেয়ে আজ পর্যন্ত মাতাল হইনি আমি, তাও জানা নেই আপনার। তেমনি জানা নেই দুপুর বেলা ছোকরাকে অনুসরণ করবার পর কি কি ঘটেছিল। আমি জানি। কারণ, আমি গিয়েছিলাম ওকে ডেকে আনতে। দরজার ফাঁকে চোখ রেখে সব দেখেছি আমি। অথচ এ ব্যাপারে কাউকে কিছুই বলেনি লোকটা। ফেরেনসির গুহার কাছে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটাও আপনার জানা নেই। রাটল্যান্ডের রিভলভারে যে একটাও গুলি ছিল না, ও যে শত্রুপক্ষের ওপর একটা গুলিও করবার সুযোগ পায়নি, এ কথা জানা ছিল আপনার?'

এইবার একটু যেন ভড়কে গেল জ্যাক ডেল। চোখ-মুখ নানান ভাবে বিকৃত করে ভাবল কয়েক সেকেন্ড। 'এসব কি বলছেন আপনি!'

'আমি দর্শক মাত্র। রাটল্যান্ডের ব্যাপারটা আমি কিছুই টের পেতাম না যদি না মাসুদ রানা ওর রিভলভারটা পরীক্ষা করত। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চলে গেল লোকটা হেনরীকে সাহায্য করতে। তখন আমি নিজে পরীক্ষা করলাম রিভলভারটা। ছ'টা কার্তুজের খোল পোরা আছে রিভলভারে কিন্তু গুলি একটাও নেই। পরপর তিনবার চেষ্টা করেছিল রাটল্যান্ড গুলি করবার, তিনটে খোলের গায়ে দুটো করে হ্যামারের দাগ। তারপরেই ওর মগজ ফুটো করে বেরিয়ে যায় শত্রুপক্ষের গুলি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি, রাটল্যান্ডকে হত্যা করা হয়েছে। এবং সে হত্যায় হাত আছে এই ইয়টেরই কারও। ব্যাপারটা পূর্ব-পরিকল্পিত।'

'আপনি বলতে চান, রানা...'

'আমি শুধু জানতে চাই লোকটা আসলে কে? নিরীহ ক্যামেরাম্যান সে নয়। হলে এসব ব্যাপার চেপে যেত না। আমি জানতে চাই কি উদ্দেশ্যে

এসেছে এই লোক সোফিয়ায়? আপনার কাছ থেকে যদি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া না যায় তাহলে পুরো ব্যাপারটা হেনরীকে জানাব আমি। আমার মনে হয় মস্ত কোন ভজঘট আছে কোথাও।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বক্তব্য গুছিয়ে নিল জ্যাক ডেল।

'আমার মনে হয় ভজঘট আর কোথাও না, আপনার মাথায়,' বলল সে। 'ও এই ইয়টে আসতে চাইবে কেন, আমি জোর করে ধরে এনেছি ওকে। এখানে ওর কোন বদ মতলব নিয়ে আসবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আমি যে ওকে এই ইয়টে বেড়াতে আসার অনুরোধ জানাব তা আমি নিজেই জানতাম না—রানা তো দূরের কথা। খুনখারাবি আর রাটল্যান্ডের মৃত্যুর সাথে কেন ওকে জড়াতে চাইছেন আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমি জানি মাসুদ রানা একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী সৎ লোক। এর বেশি আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই আমার। ইচ্ছে করলে আপনি হেনরীর কান-ভাঙানি দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন, বারণ করব না। তবে আমার বন্ধুকে আমি শেষ পর্যন্ত ডিফেন্ড করব, এটুকু নিঃসংশয়ে জানাতে পারি। এবার আপনি আসুন, ডাক্তার। ঘুম পেয়েছে আমার।'

ঘুমের লেশমাত্র দেখতে পেল না ডাক্তার জ্যাক ডেলের চোখে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রেগে ভূত হয়ে গেছে সে। মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল জ্যাকোপো ডেলের কেবিন থেকে। টলতে টলতে এগোল হেনরী হার্স্টের কেবিনের দিকে।

ইয়টটা তখন মেসিনা প্রণালী দিয়ে পৌরাণিক উপকথার কুখ্যাত অশুভ স্কাইলা ও ক্যারিবৃডিস দ্বীপের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে টাওরমিনার দিকে।

নোঙর ফেলবার দশ মিনিটের মধ্যেই ইয়টের গায়ে এসে ভিড়ল একটা লাইটার। রেডিওর মাধ্যমে খবর পেয়ে প্রয়োজনীয় মালপত্র ও বাজার নিয়ে এসেছে। ইয়টের মাস্তুলটাকে ক্রেন বানিয়ে শুরু হয়ে গেল মাল তোলার কাজ।

নাবিকরা এক্সপার্ট এসব কাজে। বড় বড় বাক্স, শাক-সব্জীর ঝুড়ি তোলা হচ্ছে লাইটার থেকে। এক ইঞ্চি ব্যাসের পাকানো স্টীলের তারের মাথায় লাগানো হুকে মালপত্র ঝুলিয়ে মাস্তুল দণ্ডটা ঘুরে চলে আসছে স্টোরের মুখে অপেক্ষমাণ খালাসীদের কাছে, তারা মাল খালাস করে নিলেই ফিরে যাচ্ছে আবার আরও মাল তুলে আনবার জন্যে। ইয়টের মোটর দিয়েই চলছে ক্রেন। চালাচ্ছে একজন দক্ষ অপারেটার।

অতিথিদের কেউ কেউ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে ভারোত্তোলনের তামাশা দেখছে, কেউ কেউ মাউন্ট এটনা আগ্নেয়গিরির চূড়োর দিকে চেয়ে রয়েছে। ইঞ্জিনরুমের উপর একটা ডেক চেয়ারে বসে আছে ফেরেনসি, দাঁতের ফাঁকে চুরুট চেপে ধরে মগ্ন হয়ে আছে নিজের চিন্তায় তীরের দিকে চেয়ে। হার্স্ট বা

জ্যাকোপো কেউই নেই ডেকে, মিনিট পনেরো আগে নেমে গেছে নিচে। লরেলী কম্প্যানিয়ন-ওয়েতে দাঁড়িয়ে চটুল ভঙ্গিতে গল্প করছিল গগলস-সুন্দরীর সাথে, কথা শেষ করে রানার দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চলে গেল নিচে। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে রানাও হাসল মুচকে।

স্টীল কেব্‌লের হুইলটা ঘুরতে শুরু করল। থরথর কাঁপছে সেটা। লাইটারের ডক থেকে মস্ত একটা কাঠের প্যাকিং কেস উঠছে ধীরে ধীরে। বাক্সের গায়ে পশ্চিম জার্মেনীর এক ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারারের নাম স্টেনসিল করা। ইয়টের চার্জিং প্ল্যান্টের জন্যে একটা স্পেয়ার ডায়নামো রয়েছে বাক্সের ভিতর।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে গোটা দুয়েক টান দিয়েই কান খাড়া হয়ে গেল রানার। মোটরের শব্দটা হঠাৎ কয়েক পর্দা উঠে গেল না? কেন?

কাঠের বাক্সটার দিকে চেয়েই বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। জোর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছে ওটা। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল হুইলের পাশে দাঁড়ানো অপারেটার।

'ফেঁসে গেছে! হাইড্রলিকটা ফেঁসে গেছে!'

বার বার চাপ দিচ্ছে সে একটা কন্ট্রোল লিভার, চেষ্টা করছে ওটার ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না তাতে। পাগলের মত এটা ওটা টিপছে সে। কোনটাতেই হচ্ছে না কিছু।

বিপজ্জনক বেগে প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সটা উঠে যাচ্ছে মাস্তুলের মাথায় লাগানো পুলির দিকে। তীব্রবেগে ঘুরে চলেছে হুইল।

এক্ষুণি ফুরিয়ে যাবে স্টীলের তার, প্যাঁচানো হয়ে যাবে সবটা। বাক্সটা উঠে যাবে মাস্তুলের মাথায়, টান টান হয়ে যাবে স্টীলের তার, কয়েক সেকেন্ড মাস্তুলের মাথায় পুলির সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে বাক্সটাকে এপারে নিয়ে আসবার অসম্ভব চেষ্টা চলবে। প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করবে হুইলটা।

তারপরেই ছিঁড়ে যাবে তার। সাঁ করে নেমে আসবে বাক্সটা।

বাক্সটা কোথায় পড়বে দেখে নিল রানা চট করে।

ঠিক যেখানটায় ডেক চেয়ারে বসে ভাবুক দৃষ্টিতে পারের দিকে চেয়ে চুরুট টানছে প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসি সেই বরাবর নেমে আসবে ওটা। গগলস-আঁটা সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছে ফেরেনসির পাশে। কি যেন বলছে মেয়েটা, উত্তর দেয়ার জন্যে দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুট সরাচ্ছে ফেরেনসি।

আধটন ওজনের ডায়নামোটা সোজা নেমে আসবে এখুনি ওদের দু'জনের মাথার উপর।

তেরো

মুহূর্তে বুঝে নিল রানা, এখন চিৎকার করে সাবধান করবার সময় নেই। সময় মোটেই নেই। এখন প্রয়োজন তৎপরতা। সেই সাথে বিদ্যুৎবেগ।

ঝড়ের বেগে এগোল ও, চোখের পলকে অতিক্রম করল প্রায় পঁচিশ ফুট দূরত্ব। ওর হাতের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে ওপাশের রেলিঙে আছড়ে পড়ল ফেরেনসি। গগলস আঁটা মহিলার কোমর জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে ঝাঁপ দিল রানা সামনে। হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন ডেকের উপর। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই কয়েক গড়ান দিয়ে সরে গেল সে যতদূর সম্ভব।

এই আচমকা আক্রমণে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, হাত পা ছুঁড়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রানাকে, এলোমেলো হয়ে গেছে চুল, স্কার্ট সরে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে ফর্সা উরু অশোভন ভঙ্গিতে। গগলস খসে ছিটকে চলে গেছে কোথায় তার ঠিক নেই। কনুই দিয়ে রানাকে গুঁতো মেরে উঠে বসবার চেষ্টা করল। ঠেসে ধরে রাখল ওকে রানা।

'বোকামি করবেন না! মাথা নিচু করে রাখুন,' ধমক দিল রানা।

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল মহিলার ছটফটানি। কলজে হিম করা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল অপারেটারের কণ্ঠ থেকে। বেসুরো, কর্কশ, ভয়াবহ চিৎকার। বাক্সটা মাস্তুলের মাথায় আটকে গেছে শক্ত হয়ে, টান হয়ে আছে স্টীলের কেব্‌ল্। একগুঁয়ে ভঙ্গিতে ঘুরেই চলেছে হুইলটা—প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে তারের উপর। আর সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে গেল তার।

সাঁ করে নেমে এল প্রকাণ্ড বাক্সটা ডেকের উপর। ঠিক যেখানটায় এই একটু আগে নিশ্চিন্তে বসে ছিল ফেরেনসি।

এত উঁচু থেকে এত ভারী ডায়নামো নেমে আসায় ডেক চুরমার করে দিয়ে চলে গেল ওটা নিচের ইঞ্জিন রুমে। জোর ঝাঁকুনি খেয়ে মাথা উঁচু করে দেখতে যাচ্ছিল মহিলা, রানার ধমক খেয়ে চট করে নিচু করল মাথা।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ছেঁড়া তারটা কিলবিল করে উঠল ভয়ানক এক হিংস্র সাপের মত। স্টীলের সাপ।

হুইলের টানে প্যাঁচ খেতে খেতে রানা ও গগলস সুন্দরীর মাথার উপর সেকেন্ড তিনেক নাচানাচি করে একলাফে চলে গেল ওটা হুইলের পাশে দাঁড়ানো স্তম্ভিত, আতঙ্কিত অপারেটারের কাছে।

হাঁ হয়ে গেল লোকটার মুখ ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে ওঠার জন্যে, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না। তার আগেই কাটা পড়ল ওর গলা। ধড় থেকে আলাদা হয়ে মাথাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক গজ দূরে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল লোকটার মুণ্ডহীন ধড় এক হাতে উইঞ্চ

কন্ট্রোল ধরে, যেন এখনও চেষ্টা করছে সে কিছু একটা করবার। তারপর ধড়াস করে পড়ল ডেকের উপর।

ঘুরেই চলেছে হুইলটা। তার প্যাঁচানো হয়ে গেছে, তবু ঘুরে চলল সেটা। ঘুরছে তো ঘুরছে তো ঘুরছেই।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল গগলস-সুন্দরী রানা ছেড়ে দিতেই। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিরল রানার দিকে।

'অথচ আমি ভাবতাম কেউ দেখতে পারে না আমাকে।'

দুইহাতে চোখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল মহিলা বাচ্চা মেয়ের মত।

এতবড় একটা বিপর্যয়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখল স্যোফিয়ার নাবিকরা। বাছাই করা দক্ষ লোক এরা, সুশিক্ষার ফলে নিয়ম শৃঙ্খলা এদের অস্থি মজ্জায় এমনই ভাবে প্রবেশ করেছে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কাজে লেগে গেল ওরা সহজ ভঙ্গিতে।

তিন-চারজন মহিলা অতিথি তারস্বরে চিৎকার করছে, পুরুষরা শিউরে শিউরে উঠছে এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বীভৎসতা দেখে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল দু'জন নাবিক, ঝুঁটি ধরে মাথাটা তুলে এনে ধড়ের পাশে রাখল একজন, অপরজন ঢেকে দিল লাশটা একখানা পাল দিয়ে। একজন পরপর গোটা চারেক লাথি মারল ফুয়েল পাইপের উপর। থেমে গেল মোটরের হৃৎস্পন্দন। আরেকজন পৌঁছে গেল এক বালতি পানি আর খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে—রক্ত মুছে ডেক পরিষ্কারের কাজে লেগে গেছে সে।

এমনি সময়ে ধুপধাপ পা ফেলে উপরে উঠে এল হার্স্ট।

'এসব কি হচ্ছে এখানে?' গর্জে উঠল সে। চোখে মুখে বিস্ময়।

যেন জানে না, ন্যাকা! ভাবল রানা। আকাশ থেকে পড়েছে একেবারে। নিষ্পাপ দেব-শিশু, জানেও না এই দু'মিনিট আগে বিশ্বাসঘাতক ফেরেনসিকে ডায়নামো চাপা দিয়ে হত্যার জন্যে চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে বাক্সটা ফেলবার ব্যবস্থা কে করেছে।

হয়তো সত্যিই জানে না। বোঝার উপায় নেই। কাকে সন্দেহ করবে সে?

কারণ হার্স্টের মতই যেন কিছুই জানে না এমনি ভঙ্গিতে ডেকের উপর উঠে এল ডক্টর জ্যাকোপোও। ঘোলা দু'চোখে চাইল চারপাশে। নিঃশ্বাসে হুইস্কির গন্ধ।

'রক্ত কিসের? হাত-পা কাটল কারও?'

একজন নাবিক ক্রেন অপারেটারের ধড় আর মাথাটা দেখিয়ে দিল কাপড় উঁচু করে। মুহূর্তে দূর হয়ে গেল ডাক্তারের টালমাটাল অবস্থা, স্বচ্ছ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি।

'জেসাস! কি করে হলো এটা?'

ডাক্তার ও হার্স্টকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল রানা, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। এদের দু'জনের কারও ব্যবহারেই এমন কিছু পেল না যা দিয়ে বেছে

নেয়া যায় একজনকে গুপ্তঘাতক হিসেবে।

নিরতিশয় বিস্মিত হয়েছে হার্স্ট। অবাক হয়ে দেখছে ডেকের গর্তটা। বলল, 'ভাগ্যিস কেউ ছিল না এখানটায়। থাকলে…'

'ছিল,' কথা বলে উঠল এক প্রত্যক্ষদর্শী কোটিপতি। 'প্রফেসার ফেরেনসি আর মিসেস লিজি হ্যামার ছিল ঠিক ওইখানেই।'

'তাই নাকি!' আঁৎকে উঠে এদিক ওদিক খুঁজল হার্স্ট ওদের দু'জনকে। 'তারপর?'

'এই ইজিপশিয়ান ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ায় রক্ষা পেয়েছে আজ ওরা দু'জন।' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল লোকটা।

আড়চোখে খেয়াল করল রানা চট করে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার হার্স্ট ও ডক্টর জ্যাকোপো।

ত্রুটি বের করে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগল না হার্স্টের। হাইড্রলিক পাইপিং চেক করতে গিয়ে ইঞ্জিনরুমে পাওয়া গেল গোলমাল। মাস্টার সিলিন্ডারে। পিস্টনটা নিচু হয়ে আটকে রয়েছে বলে হাইড্রলিক ফ্লুইডের চলাচল বন্ধ করবার কোন উপায় নেই। রিলিজ অ্যাপারচারের ঠিক নিচে ওভারস্পিলের মধ্যে আটকে আছে একটা ম্যাচের কাঠি। মানুষ হত্যার অস্ত্র হিসেবে খুবই নগণ্য জিনিস। কিন্তু ঠিকমত ব্যবহার জানলে অসামান্য হয়ে ওঠে সামান্য জিনিসই।

'এটা এখানে এল কি করে!' চাপা গলায় বলল হার্স্ট। 'আশ্চর্য! এ সম্ভাবনা লাখে,…না, কোটিতে এক। অসম্ভব ব্যাপার!'

'খুবই সম্ভব,' মনে মনে বলল রানা। 'এটা এখানে রাখলে কি ঘটবে জেনে শুনে বুঝেই গুঁজে দেয়া হয়েছে কাঠিটা। তার ছিঁড়ে ডায়নামোটা কোথায় পড়বে পরিষ্কার জানা ছিল হত্যাকারীর। আর একবার আঘাত হেনেছে গুপ্তঘাতক ফেরেনসির উপর।'

এবং নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে সে পুরোপুরি। এবারও উপর থেকে নেমে এসেছে মৃত্যু।

গত কয়েকদিন কিছুটা খেলা খেলা হিসেবে নিয়েছিল রানা সবটা ব্যাপার, কিন্তু আজ লোকটার নির্মমতায় সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে, চোখের সামনে নাবিকটাকে খুন হয়ে যেতে দেখে, তীব্র এক ঘৃণার সৃষ্টি হলো ওর মধ্যে। আসলে রেগে গেছে রানা। প্রতিপক্ষের ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে ভড়কে যাওয়া তো দূরের কথা, জেদ চেপে গেল ওর মধ্যে। ফেরেনসিকে হত্যার চেষ্টায় কোন দোষ দেখতে পায়নি সে। বুঝে শুনেই এই বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়েছে ফেরেনসি, জানে ঝুঁকি আছে এ কাজে। কিন্তু ওই নাবিকটা কি দোষ করেছিল গুপ্তঘাতকের কাছে? কিংবা ওই মেয়েটা? ফেরেনসিকে খুন করতে গিয়ে মারা গেল এক নিরপরাধ নাবিক। মেয়েটাও মারা যেতে পারত। কোন দাম নেই এদের জীবনের? নিজের কার্যসিদ্ধিটাই বড় কথা। সেটা করতে গিয়ে যদি আর কারও প্রাণ যায় কিছুই এসে যায় না তাতে? আর সবাই এর কাছে মশামাছির মত?

ম্যাচের কাঠিটা রাখল কে ওখানে? শুধু নিষ্ঠুরই নয়, বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক ধূর্ত লোকটা। আশ্চর্য সহজ উপায়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল ফেরেনসিকে।

হার্স্ট, জ্যাকোপো, দু'জনেই নিচে ছিল দুর্ঘটনার সময়। কিন্তু খুনীকে অন্তত একটি বার উঁকি দিয়ে দেখতে হয়েছে ঠিক জায়গা মত রয়েছে কিনা প্রফেসার। সে কে? কোন্ জন? আর একবার মরণছোবল দিয়েছে সে, কিন্তু তাকে চিনে নিতে পারেনি রানা। আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে সে।

হৈ-হৈ শব্দ শুনে ডেকের সবাই ফিরল ডানদিকে। বড়সড় একটা স্পীডবোট ভিড়ছে সোফিয়ার গায়ে। প্রথম দর্শনে মনে হলো একগাদা ফর্সা চামড়া, পরমুহূর্তে বোঝা গেল সামান্য হলেও অল্পবিস্তর কাপড় আছে সবারই গায়ে—চার-পাঁচজন সুন্দরীকে নিয়ে মোটাসোটা এক টেকো ইটালিয়ান বোট ভিড়াচ্ছে, আর বাজখাঁই গলায় চিৎকার করছে।

'এই যে হেনরী! বলি ব্যাপারখানা কি? হাজারবার দাওয়াত করেও যার পাত্তা পাওয়া যায় না, আজ দেখি লক্ষ্মীছেলের মত নোঙর ফেলছে আমার রাজত্বে!' উঠে এল টেকো লোকটা। কান পর্যন্ত হেসে চিৎ করল হাত দুটো। 'চিড়িয়া তো উড় গিয়া! যাদের লোভে এসেছ, তারা হঠাৎ জরুরী তার পেয়ে চলে গেছে হলিউড। পরশু ফিরবে। কাজেই এই গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো না দিয়ে আর উপায় নেই বাছাধনের। কিন্তু এ রকম গম্ভীর কেন? হয়েছেটা কি?'

চারদিকে নজর বুলিয়েই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল লোকটার। দুর্ঘটনার বর্ণনা শেষ হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। সোজা চাইল হার্স্টের চোখে।

'নাহ্, এটা এখন আর বাসযোগ্য নেই। বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে চলে এসো আমার ভিলায়। যে ক'দিন মেরামত না হচ্ছে, সে ক'দিন বেড়িয়ে যাও আমার ওখান থেকে। কোন অসুবিধে নেই, জায়গারও অভাব হবে না। কি বলো?'

স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল হার্স্টের মুখে।

'ঠিক আছে, থ্যাডিউস। তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। চার্জিং প্ল্যান্টটা গেছে, কারেন্ট থাকবে না দু'দিন। আমাকে অবশ্য ইয়টেই থাকতে হবে দেখাশোনা করার জন্যে, কিন্তু এদেরকে নিয়ে যাও। ঠিকই বলেছ, এটা এখন আর বাসযোগ্য নেই।'

ইটালীর সেরা চারজন বড়লোকের একজন হচ্ছে থ্যাডিউস গুইসেপ। গুইসাপের মত খসখসে চামড়া থলথলে গায়ে। টাকটা গম্বুজের মত গোল। গোটাকয়েক গাড়ি, রেডিও, টেলিভিশন আর জেনারেল ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টরি থেকে এত প্রবল বেগে টাকার বৃষ্টি হচ্ছে লোকটার চারপাশে যে খরচ করে কুল পাচ্ছে না বেচারা, ব্যাংকের খানাখন্দ ভরে একেবারে উপচে

পড়ছে—চারদিকে থৈ থৈ টইটম্বুর অবস্থা। তাই সুন্দরীরা এর পাশ থেকে নড়তে চায় না। জড়াতে চায় যত ভাবে পারে। আর এই ব্যাটাও ঘুঘু—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু বিয়ের নাম করে না।

বাগান-বাড়িটা বানিয়েছে বড় সুন্দর জায়গায়। এলাকাটা পাহাড়ী। সমুদ্রের একটা অংশ ছোট্ট এক উপসাগরের মত ঢুকে এসেছে ওর সীমানার মধ্যে। তারই পাশে ঝকঝকে হোয়াইটওয়াশ করা গুইসেপ ভিলা। রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড দালান।

'প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি হয়েছে বাড়িটা,' প্রশংসার দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে চেয়ে রানার কানে কানে বলল প্রফেসার ফেরেনসি। ক্যাডিলাক আর রোলস রয়েসের মিছিলে বয়ে নিয়ে চলেছে অতিথিদের গুইসেপ ভিলার দিকে। 'কয়েকটা দারুণ মূর্তি আছে এখানে, চলুন দেখবেন।'

সত্যি, দেখবার মত বটে। যথেচ্ছ মার্বেল পাথরের ব্যবহারে ঝকঝক করছে বাড়ির ভিতরটা। বিশাল এন্ট্রান্স হলের ঠিক মাঝখানটায় হৃৎপিণ্ডের আকৃতি একটা টলটলে সুইমিং-পুল। তার পাশেই বেশ বড়সড় একটা অখণ্ড মার্বেল পাথরের বেদির উপর অপূর্ব এক সোনালী নারী মূর্তি। কাছে যেতেই বোঝা গেল সোনার নয়, মার্বেলের উপর গিলটি করা। জায়গায় জায়গায় রঙ চটে গেছে। একটা পা ভাঙা, জোড়া লাগানোর ফাটা দাগ দেখা যাচ্ছে গোড়ালির কাছে। এছাড়া আর কোন খুঁত নেই। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা। আশ্চর্য নিখুঁত মূর্তি। কবে কোন্ ভাস্কর তৈরি করেছিল কে জানে। কোন তন্বী তরুণীর লোভনীয় মূর্তি নয়, পরিপূর্ণ নারীর মূর্তি—চেহারায় ফুটে রয়েছে গভীর বেদনার চিহ্ন।

'খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর!' গদগদ ভাবে বলল প্রফেসার ফেরেনসি। 'পার্থেননের ভাস্করদের কথা শুনেছেন তো? পলিগনোটাস স্কুলের। খুব সম্ভব ফিডিয়াস বা তার ভাই প্যানেনাসের তৈরি এ মূর্তি। অমূল্য! তুলনা নেই।'

অতিথিদের আরাম আয়েশের সব রকম ব্যবস্থার জন্যে হাঁক ডাক করছিল থ্যাডিউস গুইসেপ, এক দঙ্গল চাকর বাকরকে হুকুম করছিল রোমান সম্রাট সিজারের ভঙ্গিতে। এগিয়ে এল রানা আর ফেরেনসির দিকে। প্রফেসারের শেষ কথাটা কানে যেতেই হাসল একগাল।

'ঠিক বলেছেন। কোন তুলনা হয় না। অ্যাপোলো আর আর্টেমিসের হাতে নিহত সন্তানদের শোকে মুহ্যমান নাইয়োব। অপূর্ব না? পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভাস্কর্য। আরও কয়েকটা আছে, দেখবেন খন। এখন আপনাদের যার যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করে নিন খানিকটা। লাঞ্চের সময় হয়ে এল।'

রানাকে দেয়া হয়েছে প্রকাণ্ড এক ঘর। অত্যন্ত দামী আসবাবে সুসজ্জিত। মনে মনে হিসেব করল রানা, কার্পেট, আসবাব আর দেয়ালের পেইন্টিংগুলো বেচে দিলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাওয়া যেতে পারে।

জানালার পাশে এসে দাঁড়াল ও। প্রায় আশি ফুট নিচে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড এক দীঘির মত বাচ্চা উপসাগরটা। সমুদ্রের দিকটা ছাড়া বাকি সব দিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঘোড়ার খুরের আকৃতি। মৃদু বাতাসে শিরশিরে ঢেউ

উঠেছে লেগুনের নীল পানিতে।

দরজাটা আধ-খোলা রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিল রানা।

পাশের ঘরটা এই করিডরের শেষ ঘর। এই ঘরটা দেয়া হয়েছে ফেরেনসিকে। রানার দরজা না ডিঙিয়ে কারও পক্ষে ফেরেনসির ঘরে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা।

কে হত্যাকারী? এখনও কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না কেন সে। কারও চরিত্রের সাথেই পুরোপুরি মিলছে না গুপ্তঘাতকের চরিত্র। অথচ সে যে ইয়টেরই কেউ, তাতে আর কোনরকম সন্দেহের অবকাশ নেই। সবার সাথেই হাসছে, খাচ্ছে, গল্প করছে লোকটা, মিশছে সহজভাবে। কিন্তু সুযোগ পেলেই আঘাত হানতে দ্বিধা করছে না সে এক সেকেন্ডও। আশ্চর্য চাতুর্যের সাথে হানছে চরম আঘাত। দু'দু'বার আক্রমণ হলো ফেরেনসির উপর রানারই সামনে—দর্শকের মত দেখেই গেল সে, টের পেল না আঘাতটা হানল কে। কমপ্লিট স্কিযোফ্রেন নয় তো? হয়তো দুটো আলাদা সত্তা কাজ করছে একজনের মধ্যে, দুটো আলাদা মানুষ, জেকিল আর হাইডের মত, একটার অস্তিত্ব জানা নেই অপরটার। তাই কি মুশকিল হচ্ছে ওকে চিনে বের করতে। ঢাকা থেকে ওকে বলা হয়েছে গুপ্তঘাতক হয় হার্স্ট, নয় জ্যাকোপো। ওদের দু'জনের ভাব দেখে রানা ভাবছে এখন, কাজটা দু'জন মিলে করাও অসম্ভব নয়। কিংবা হয়তো এদের দু'জনের কেউই না—সম্পূর্ণ বাইরের কোন লোক। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছে কোথায়?

চোখ দুটো লেগে এসেছিল, পায়ের শব্দে সজাগ হয়ে চোখ মেলল রানা। উর্দি পরা বেয়ারা একজন।

'লাঞ্চ টাইম, সিনর। নিচে সবার সাথে খাবেন, না ওপরে পাঠিয়ে দেব?'

'না, না। পাঠাতে হবে না। আমি আসছি।' উঠে বসল রানা বিছানায়।

পাশের ঘরের দরজায় টোকা দিল বেয়ারা। তালা খোলার শব্দ শুনে মনে মনে হাসল রানা। ভয় পেয়েছে ব্যাটা। ভালই। এর ফলে ওকে অতর্কিতে খুন করা সহজ হবে না হত্যাকারীর পক্ষে। কোনরকম সংশয় নেই আর ফেরেনসির মনে। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে ওকে হত্যা করবার জন্যেই ছাদ ধসে পড়েছিল প্রত্নতত্ত্ব-গুহায়, ওকে হত্যা করবার জন্যেই চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে পড়েছিল আজ ডায়নামোর বাক্স। কাজেই কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে আর এখন। কারও বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে দরজায় তালা লাগানো অভদ্রতা। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে, প্রাণ দিতে রাজি না ফেরেনসি। বেয়ারা চলে যেতেই আবার তালা লাগিয়ে দিল।

খানিক বাদেই পাশের ঘরে বাথরুমের কল থেকে পানি পড়বার শব্দ শুনে কান খাড়া হয়ে গেল রানার। কোন স্পাইয়ের ঘর থেকে যদি পানি পড়বার শব্দ আসে তার মানেই যে সে গা ধুচ্ছে তা নয়, পানি পড়বার শব্দ হলে ঘরে কোন লুকোনো মাইক্রোফোন থাকলে তার কার্যকারিতা অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়, উদ্দেশ্যটা গোপন সংবাদ আদানপ্রদানও হতে পারে। ডবল এজেন্টরা

তো ডবল সাবধান। ঘরে কোন গোপন মাইক্রোফোন থাকতে পারে ভেবে নেয়া ফেরেনসির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব টেলিফোন বা বেতারে কারও সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে লোকটা।

ত্রস্তহাতে ক্যাপসুল-আকৃতির ট্র্যান্সমিটার আর রিসিভার সেট বের করল রানা। সেই সাথে একটা খোপের মধ্যে থেকে বের করল একটা প্যারাবোলিক মাইক্রোফোন আর একটা টেলিস্কোপিক এরিয়াল। মাইক্রোফোন ও এরিয়ালের সকেট দুটো যথাস্থানে ঢুকিয়ে নিয়ে জানালার ধারে চলে এল সে দ্রুতপায়ে।

হাত বাড়িয়ে পাশের ঘরের জানালার কাছে ধরল রানা মাইক্রোফোনটা। ছড় ছড় পানি পড়ার আওয়াজে প্রথমটায় প্রফেসারের একটি কথাও বুঝতে পারল না সে। কিন্তু মাইক্রোফোনের প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টারটা নেড়েচেড়ে ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে প্রফেসার সেদিকটায় মুখ করতেই একটা দুটো শব্দ শুনতে পেল সে। আর একটু অ্যাডজাস্ট করতেই পরিষ্কার শোনা গেল ফেরেনসির কণ্ঠ।

'ঠিক আছে।' অল্পক্ষণ বিরতি। 'ঠিক আছে। আজ রাতে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে আসছি।' আবার অল্প বিরতি। 'হ্যাঁ। কৈফিয়ত তো আমি চাইবই। তৈরি হয়ে আসবেন। ও. কে. দেখা হবে তাহলে। ট্যাংকের ধারে। রাখলাম।' দু'সেকেন্ড পর আবার কথা বলে উঠল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ট্যাংকটা। রাখি তাহলে।' খটাং করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল ফেরেনসি।

কার সাথে কথা হলো? কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে লোকটা আজ রাতে? ওর মত আর কেউ শুনে ফেলেনি তো কথাগুলো? গুপ্তঘাতক।

ভেবে দেখল রানা, না, সেটা সম্ভব নয়। এই ঘরে গোপন মাইক্রোফোন ফিট করবার সময় পায়নি হার্স্ট বা জ্যাকোপো কেউই। হঠাৎ করে হাজির হয়েছিল থ্যাডিউস গুইসেপ। হঠাৎ করেই প্রস্তাব দিয়েছিল সবাইকে এই বাড়িতে নিয়ে আসার। কাজেই কোন কৌশলের সময় পায়নি গুপ্তঘাতক। অর্থাৎ আজ রাতে কোথায় কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ফেরেনসি সেটা জানা নেই তার। কার সাথে দেখা করবে তা রানারও জানা নেই, কিন্তু কোথায় দেখা করবে শুনে নিয়েছে। পিছু পিছু যাবে সে। ট্যাংকের ধারে।

জানালা থেকে সরে আসবার আগে ট্যাংকের দিকে চাইল রানা। নিচে উঁচু দেয়াল ঘেঁষে পানির ধারে বিরাট ট্যাংকটা। ট্যাংকের উপর এক সেকেন্ডও দৃষ্টিটা স্থির রাখতে পারল না রানা—চট করে সরে এল সেটা বাচ্চা উপসাগরের জলে।

ধড়াস করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ।

নীল সাগরের জলে আশ্চর্য প্রাণ চাঞ্চল্য। দশ, পনেরো বিশ ফুট লম্বা কি যেন সব কিলবিল করছে ওখানে। ছায়া ছায়া—প্রকাণ্ড। পিঠের ডানা উঁচু হয়ে আছে পানির উপর। সাঁই সাঁই পানি কেটে চক্রাকারে ঘুরছে ওরা।

হাঙর! উপসাগরটা নানান জাতের হাঙরে ভর্তি।

এতক্ষণে লক্ষ করল রানা, সমুদ্রের দিকটায় ইস্পাতের শিক দিয়ে বেড়া দেয়া আছে।

বেড়ার এপাশে কিলবিল করছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

'আমার শখ,' বলল গুইসেপ। 'সেই ছোটকাল থেকেই।' হাসি হাসি মুখ করে চাইল সবার দিকে।

পরিতৃপ্তির সাথে খেতে দিচ্ছে না লোকটা। টেবিলের উপর সাজানো আছে হরেক রকম অতুলনীয় সুস্বাদু খাবারের ডিশ—ক্যাভিয়ার, প্যাটে ডি ফোই গ্রাস, অক্টোপাস, গলদা চিংড়ি—আরও কত কি! অপূর্ব সুগন্ধে নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাওয়ার দশা—এই অবস্থায় বড় বিরক্তিকর লাগছে রানার থ্যাডিউস গুইসেপের বক্তৃতা। কিন্তু না শুনেও উপায় নেই। বলেই চলেছে লোকটা।

'দারুণ ভাল লাগে আমার মাছ। এদের চলার সহজ সাবলীল ভঙ্গির দিকে চেয়ে থাকলে আশ্চর্য এক বিশ্রামের ভাব এসে যায় আমার মধ্যে। তাছাড়া চুপচাপ। দেখুন চেয়ে, চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, অথচ এতটুকু তাড়াহুড়ো নেই, শব্দ নেই, হৈ চৈ নেই। শান্ত। জন্তু-জানোয়ার পুষলে ঘেউ ঘেউ, মিউ মিউ কত কি! আর এদের দেখুন, কি প্রচণ্ড শক্তি, অথচ কি ধীর স্থির রাজসিক এদের চলাফেরা।' আপন মনেই হাসল গুইসেপ কাঁচের দেয়ালের দিকে চেয়ে।

বাড়িটার গ্রাউন্ড লেভেল থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচের একটা ঘরে লাঞ্চ খেতে নেমেছে ওরা। মস্ত ঘরটার তিনদিকে পাথুরে দেয়াল, এদিকে তিন ইঞ্চি পুরু আর্মার প্লেট গ্লাসের দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে সেই বাচ্চা উপসাগরের নীল পানি। বিভিন্ন দিক থেকে ফ্লাড লাইটের আলোর ব্যবস্থা থাকায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে অমসৃণ পাথুরে তলদেশ, দুলছে শ্যাওলা। মাঝে মাঝে সাঁতরে এসে উঁকি দিচ্ছে এক একটা বিশাল অশুভ দৈত্য। মনে হচ্ছে জোরে এক ঠোকর দিলে কাঁচ ভেঙে চলে আসবে এপারে।

'মানুষ কি?' এইবার শুরু হলো দর্শন। 'আসলে কিন্তু আমরা দৈত্য। হাঁটতে শেখা মাছ। পানি থেকে উঠে এসেছি, একদিন ফিরে যাব পানিতেই। যাই হোক, হাঙরের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক...'

সুযোগ পেয়ে খুব একহাত ঝেড়ে নিচ্ছে ব্যাটা। কথার ফাঁকে ফাঁকে যখন যে জাতের হাঙর দেখা যাচ্ছে কাঁচের ওপারে, তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর। তাগড়া চেহারার টাইগার শার্ক এল, বিকট হ্যামারহেড শার্ক এল, তারপর এল গ্রে পয়েন্ট, হোয়াইট পয়েন্ট, নার্স শার্ক, ব্লু শার্ক। কিন্তু আসলটা কাছে এল না কিছুতেই। আবছা মত বোঝা যাচ্ছে, দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল একটা হাঙর, সমুদ্রের ভয়ঙ্করতম আতঙ্ক—গ্রেট হোয়াইট শার্ক।

মানুষখেকো সব ক'টাই, কিন্তু হোয়াইট শার্কের তুলনা হয় না। সব সময়ই যেন খিদে লেগে আছে ওর পেটে। সর্বক্ষণ খাই খাই।

'আসলে ভীতু। কল্পনা করতে পারেন?' বলেই চলেছে গুইসেপ।

'রীতিমত লাজুক বলতে পারেন। মানুষখেকো বলেই ওদেরকে ভয়াল কোন জন্তু মনে করবার কিন্তু কোন কারণ নেই। ধরুন, আমরা গরু-ছাগল খাই, তাই বলে কি আমরা ভয়ানক এক জাতের রাক্ষস? আমাদের মধ্যে লজ্জা-শরম, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা নেই? আমাদের দুর্ভাগ্য, ওদের খাবারের লিস্টে আমাদের নামও আছে—নির্বিকার চিত্তে ওরা মানুষ খায়, ঠিক আমরা যেমন খাই গরু-ছাগল। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে ওরা মানুষের চেয়ে অনেক লাজুক এবং ভীতু।'

'কিন্তু যাই বলুন,' শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল লরেলী। 'বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে ওদের এই কাঁচের কাছাকাছি আসতে দেখলেই। মাছ ভাজা বা রান্না করা অবস্থায় প্লেটে করে সামনে এল, আমি খুশি। আপনি যে ব্যবস্থা করেছেন, আর আপনার লাজুক ভালমানুষগুলো যেভাবে চাইছে কটমট করে, তাতে মনে হচ্ছে আমিই প্লেটের ওপর আছি।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাইকে উঠি উঠি ভাব করতে দেখে একটা হাত উপরে তুলল গুইসেপ।

'বন্ধুগণ! আর একটা ব্যাপার বাকি আছে। সব দেখা হয়নি এখনও। এক মিনিট অপেক্ষা করুন।'

উঠে গিয়ে দেয়ালের গায়ে একটা বোতাল টিপে দিল সে। মুহূর্তে খেপে উঠল শান্তশিষ্ট, লাজুক হাঙরগুলো। তীব্রবেগে ছুটল ওরা সোজা উপর দিকে।

'ওদেরও লাঞ্চ-টাইম হয়েছে!' একগাল হেসে ঘোষণা করল গুইসেপ।

বোতাম টেপার সাথে সাথে উপরের কোন একখান থেকে স্বচ্ছ পানিতে হড় হড় করে নেমে আসতে শুরু করল রাশি রাশি মাংস, নাড়িভুঁড়ি, রাতিব, আর মাছের টুকরো। মহা হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল ক্ষুধার্ত হাঙরগুলোর মধ্যে। একটা আস্ত গাধার ঠ্যাং নেমে আসছিল, একই সাথে একটা হ্যামারহেড আর একটা টাইগার শার্ক দুদিক থেকে কামড়ে ধরল ওটাকে—দুটোই লেজ ঝাপটে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ওটা অপরের কবল থেকে। উল্টেপাল্টে কাড়াকাড়ি করতে করতে হ্যামারহেডের পিঠটা এসে ধাক্কা খেল কাঁচের গায়ে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা। আবার দূরে সরে যেতেই হেসে উঠল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে সবাই, যুগপৎ ভীতি ও আনন্দ উপভোগ করছে। সাত-আট মন ওজনের একটা মরা টানিকে মুখে করে নেমে এল বিশাল এক হোয়াইট শার্ক। সোজাসুজি কাঁচ বরাবর এসে থামল দৈত্যটা, বেকায়দা ভঙ্গিতে কামড়ে ধরে ছিল, টানির মাথাটা আগে গিলবার জন্যে ঘুরাবার চেষ্টা করছে ওটাকে।

মরা টানিটা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ছুটে গিয়েছিল ওর মুখ থেকে, সাথে সাথেই অপরিণামদর্শী এক নার্স শার্ক বোকার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল টানির উপর এক খাবলা মাংস তুলে নেয়ার জন্যে।

সামান্য একটু নড়ে উঠল হোয়াইট শার্ক। চোখের পলকে ইন্তেকাল করল নার্স। মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে গেল ওটা। মাথা ও লেজের অংশ আলাদাভাবে লাল রক্তের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নেমে গেল নিচের দিকে।

এবার নিশ্চিন্ত মনে মস্ত-টানিটাকে গিলে নিয়ে অবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল জল-দৈত্য।

'চমৎকার!' উচ্চকণ্ঠে কথা বলে উঠল একজন। 'ভাল বুদ্ধি বের করেছ থ্যাডিউস। কাউকে খুন করে গুম করে ফেলায় এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর নেই। কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না লাশ।'

কথাগুলো কে বলছে ঘাড় ফিরিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। কণ্ঠস্বরটা পরিচিত।

হেনরী হার্স্ট এসে হাজির হয়েছে।

'সাতদিনের আগে ঠিক হবে না চার্জিং প্ল্যান্ট। কাজেই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতেই হচ্ছে, হে। চলে এলাম।'

চোদ্দ

সাবধানে, খুব ধীরে খুলে গেল প্রফেসার ফেরেনসির দরজা।

পাশের ঘরে অপেক্ষমাণ রানা টের পেল ব্যাপারটা। মৃদু হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে দেড় ঘন্টা অপেক্ষার পর নিরাপদ মনে করে বেরোচ্ছে ফেরেনসি ঘর থেকে।

সারাদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। কেউ চেষ্টা করেনি প্রফেসারকে খুন করতে। খণ্ড খণ্ড দলে ভাগ হয়ে সবাই যার যার মত আনন্দেই কাটিয়েছে। দুই-দুইবার প্রাণ বাঁচানোয় রানার উপর ভক্তি এসে গেছে ফেরেনসির, সারাদিন ঘুরঘুর করেছে ওর কাছে পিঠে। রানা, লরেলী, ফেরেনসি, গুইসেপ, এবং হরিবল্ হান্টের জনাকয়েক অভিনেত্রী সাঁতার কেটেছে সুইমিং পুলে, অনর্গল হুইস্কি টেনেছে ডক্টর জ্যাকোপো, জনাতিনেক কোটিপতি জুটিয়ে নিয়ে ব্রিজ খেলেছে হেনরী হার্স্ট, কেউ ঘুরে বেড়িয়েছে বাচ্চা-উপসাগরের ধারে, কেউ বাগানে, কেউ কেউ আবার কয়েকজন জড়ো করে জমিয়ে নিয়েছে গাল গল্পের আড্ডা। যেন ডাঙায় ফিরতে পেরে খুশি সবাই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তারপর সন্ধ্যে, তারপর রাত। ডিনারের পর বহুক্ষণ ধরে চলল জমজমাট পার্টি, লঙ-প্লে রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে চলল নাচ। কটুভাষিণী বিধবা কোটিপত্নী গগলস-সুন্দরী মিসেস লিজি হ্যামার নাচের আসরে রানাকে দখল করতে গিয়ে বিফল হলো। হেরে গেল লরেলীর সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত যাদুর কাছে। হৈ-হুল্লোড় আর শ্যাম্পেন চলল মাঝরাত অবধি, অঢেল। তারপর খসতে শুরু করল একে একে। বিশেষ করে সিনেমার লোকজন কাল সকালে কিছু আউটডোর শূটিং আছে বলে কেটে পড়ল বলেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল পার্টিটা। বাকি সবাইও বসে পড়ল, তারপর আর একগ্লাস করে গিলে রওনা হলো যার যার ঘরের দিকে। ক্রমে নিঝুম হয়ে এল বিশাল প্রাসাদটা, একে একে নিভে গেল বাতি। ঘুমে ঢলে পড়ল গুইসেপ

ভিলা।

তারপরেও দেড়ঘন্টা ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে হয়েছে রানাকে। কান খাড়া করে শুনল, পা টিপে ছায়ার মত নিঃশব্দে চলে গেল ফেরেনসি।

লম্বা করিডর ধরে ওর পিছু নেয়াটা কঠিন হবে। সর্বক্ষণ ওকে চোখে চোখে রাখা যাবে না বুঝতে পেরে পিছু নেয়ার মতলব ছেড়ে দিয়েছে রানা। তাছাড়া বাড়ির ভিতর কোন রকম আক্রমণের সম্ভাবনা কম। কাজেই সোজা নিচে নেমে যাওয়াই স্থির করেছে সে। ক্যামেরার লেন্স ও অ্যাকসেসরীর অসংখ্য চামড়ার বাক্সের একটা থেকে বের করে রেখেছে সে একটা কুরলিন কর্ড। আটশো পাউন্ড ওজন সহ্য করবার ক্ষমতা আছে ওটার, কাজেই ছিঁড়বে না। ফেরেনসির পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই খাটের পায়ায় দুই প্যাঁচ পরিয়ে রশির দুটো মাথাই নামিয়ে দিল রানা জানালার বাইরে। ওর ঘরটা ছায়ায়, কেউ দেখতে পাবে না ওর নিচে নামা। কাজেই এটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

বুঝতে পারছে রানা, আজ রাতেই সব রহস্যের উন্মোচন হবে। বোঝা বললে ভুল হবে, এই রকমের একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর মধ্যে। মনে হচ্ছে, অশুভ এক ইঙ্গিতে বিপদ ঘনিয়ে আসছে আজ চারপাশ থেকে। কাজেই ফেরেনসির পিছু পিছু গিয়ে বিপদের মাত্রা বাড়াবার কোন মানে হয় না। নিচের দরজা দিয়ে বেরোবার সময় কারও পিস্তলের টার্গেট হতে চায় না সে। ভয়ানক লোকেরা আসবে আজ নিচে। ফেরেনসিও গুলি করে বসতে পারে ভয় পেয়ে। যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে প্রফেসার সে গুলি ছুঁড়তে পারে। তাছাড়া গুপ্তঘাতকের উপস্থিতিও অসম্ভব নয়। কোনরকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না আজ।

তাই ওর শোলডার হোলস্টারে গুঁজে নিয়েছে রানা আজ ওয়ালথার পি.পি কে।

ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল রানা। বাড়িটার পিছনে নামছে সে, উপসাগরের পাশের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তার উপর। একটা সোঁদা গন্ধে উপসাগরের বাসিন্দাদের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ছুটোপুটিরত হ্যামারহেড আর টাইগার শার্কের ছবি ভেসে উঠল মনের পর্দায়। কী বীভৎস শখ রে বাবা!

কাঁকর বিছানো সরু রাস্তার উপর নেমে এল রানা। বেশ খানিকটা দূরে দূরে রাস্তার পাশে উপসাগরের দিকে মুখ করে বসানো আছে শ্বেত পাথরের বেঞ্চ। দিনের বেলায় ওখানে শুয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে উপভোগ করা যায় বিশাল সব ভয়ানক মাছের খেলা।

রশিটার এক মাথা ধরে টেনে খাটের পা থেকে খসিয়ে নিয়ে এল রানা। আর একটু অন্ধকারে সরে একটা ঝোপের ধারে বাড়িটার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। নেভি-ব্লু স্যুটে মিশে গেছে সে অন্ধকারে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গোল করে গুটাতে শুরু করল লম্বা রশিটা। কোথাও প্রাণের কোন সাড়া পেল না রানা। রশিটা পকেটে পুরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

পুরো দুই মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, ভাবছিল একটু এগিয়ে দেখবে কিনা, এমনি সময়ে ছলাৎ শব্দে চমকে চাইল সে

পানির দিকে। বিশাল দুটো ডানা জেগে উঠেছে পানির উপরে, তরতর পানি কেটে ঘুরছে ও দুটো চক্রাকারে। জলকেলী? প্রেম? না, মানুষের গন্ধ পেয়েছে ওরা?

সন্ধ্যের আগেই লেগুনটা ভাল মত ঘুরে ফিরে দেখে নিয়েছে রানা। আয়তনে বিশ একর মত হবে। ঘোড়ার খুরের মত আকৃতি। সাগরের দিকের মুখটা দশ গজের বেশি হবে না। স্টেনলেস স্টীলের গ্রিল দিয়ে হাঙরগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে, সাগর থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ভিতরের পানিটা পরিষ্কার রাখায় কোন বাধা নেই। পানির কাছে পৌঁছবার একমাত্র পথ, গুইসেপ ভিলার পিছন দরজা। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা রয়েছে উপসাগর—পাছে না জেনে কেউ স্নান করতে নামে, তাই। দু'দিক থেকে দেয়াল এসে মিশেছে প্রাসাদের গায়ে। বাইরে থেকে সহজে কারও পক্ষে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

রানা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে পঁচিশ গজ দূরে ট্যাংকটা। চারটে পিলারের উপর ভর দিয়ে বিশ ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পানির ট্যাংকের মত দেখতে একটা বড়সড় স্টীলের সিসটার্ন। সিসটার্নের গা থেকে ছ'ফুট চওড়া ড্রেনের মত একটা স্টীলের শূট কোনাকুনি ভাবে নেমে এসেছে পানির দিকে। মাটির নিচের সেই কাঁচের ঘরে লাঞ্চ খেতে যাওয়ার আগে এই বিদঘুটে ট্যাংক, চওড়া ড্রেনের উদ্দেশ্য আর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়েছিল সে কিছুক্ষণ। হাঙরগুলোকে খাবার দেয়া দেখে আন্দাজ করে নিয়েছে, এই ট্যাংকের মধ্যে থাকে ওদের খাবার, একটা বোতাম টিপলেই একটা দরজা খুলে যাবে, হড়হড় করে ড্রেন বেয়ে নেমে আসবে পনেরো বিশ মন খাবার। পানির নিচে শুরু হয়ে যাবে কাড়াকাড়ি, মারামারি।

পিছনের দরজাটা খুলে গেল। ঘন আঁধার থেকে অপেক্ষাকৃত হালকা আঁধারে চলে এল কেউ একজন। বুদ্ধি করে পিছনের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তারপর দরজা খুলেছে লোকটা। সরাসরি দরজার দিকে চেয়ে কারও অপেক্ষায় না থাকলে টের পেত না রানাও। অতি সন্তর্পণে এগোল লোকটা।

কয়েক পা এগিয়ে আসবার পর চিনতে পারল রানা ফেরেনসিকে। আবছা তারার আলোয় চকচক করে উঠল ওর হাতে ধরা একটা পিস্তল। ভারবাহী উটের মত কষ্টসহিষ্ণু ভঙ্গিতে এগোচ্ছে হাড্ডি-সর্বস্ব বেঢপ আকৃতির প্রফেসার, পিস্তলটা সামনে বাগিয়ে ধরে চাইছে এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে।

আর একটু অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে সরে দাঁড়াল রানা। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রাচীন কালের মূর্তির মত। সামনে দিয়ে চলে গেল ফেরেনসি। ভীত সন্ত্রস্ত। খানিকটা করুণা অনুভব করল রানা লোকটার জন্যে। কী জীবন! কেন এল লোকটা এই লাইনে? নিশ্চয়ই শুধু টাকার লোভে নয়, আরও কিছু আছে। হয়তো সাংসারিক অনটন, কিংবা কোন হতাশা, মানে, কোন কিছুর অভাব ঠেলে দিয়েছে ওকে এই পথে। বিশ্বাসঘাতক ডবল এজেন্টের কাজ করে লোকটা অপরাধ করেছে ঠিকই, কিন্তু একজন অপরাধীর বেঁচে থাকবার আকুতি আরেকজন নিরপরাধের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—করুণা হচ্ছে রানার এইজন্যেই। যত বড় অপরাধীই হোক, একজন প্রাণ ভয়ে ভীত মানুষের

প্রতি আরেকজন মানুষের করুণা আসাই স্বাভাবিক। যদিও রানা জানে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এগারোজন এজেন্টের মৃত্যুর কারণ এই ভীত সন্ত্রস্ত লোকটা। মরতে একে হবেই।

কার সাথে দেখা করতে চলেছে লোকটা? মাফিয়ার কেউ? বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে এখন। সাবধানে হাঁটছে, কিন্তু তবু অস্পষ্টভাবে মশমশ শব্দ হচ্ছে খোয়ার উপর জুতোর চাপ পড়ে। খুব হালকা ভাবে শুনতে পাচ্ছে রানা একটা কুল কুল শব্দ—এখনও চক্রাকারে ঘুরছে হাঙর দুটো। এই ঘেরা জায়গায় সামান্য শব্দ হলেই চারদিকের প্রতিধ্বনিতে মনে হয় জোর আওয়াজ। ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু চাপড়, হাঙরের ডানায় পানি কাটার শব্দ, ফেরেনসির জুতোর আওয়াজ—সব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা, যেন ওর শ্রবণশক্তি হঠাৎ করে বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস, এমন কি হৃৎপিণ্ডের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। বুঝতে পারল রানা, মানসিক উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় অতি সজাগ হয়ে ওঠায় এই অবস্থা হয়েছে। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল ও।

ফেরেনসির গলা শোনা গেল। চাপা অস্ফুট কণ্ঠ, কিন্তু ধ্বনি-প্রতিধ্বনির দৌলতে রানার মনে হলো গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা।

'সাইমন!' ফিসফিস করে ডাকল প্রফেসার। 'সাইমন? কোথায় তুমি!'

নামটা শুনেই চমকে গেল রানা। তাহলে বিংশ শতাব্দীর রবিনহুড সাইমন পাসেরোর সাথে দেখা করছে প্রফেসার এই নিভৃতে? রোমান্টিক দস্যু, মাফিয়ার ড্রাগ ডিভিশনের চীফ—সাইমন পাসেরো। এরই বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে মারা গেছে বাংলাদেশের তেরো জন এজেন্ট। তার মানে ভাল করেই চেনে প্রফেসার পাসেরোকে। আক্রমণটা বাংলাদেশের তরফ থেকে আসছে মনে করে হয়তো সাহায্যের আশায় দেখা করছে প্রফেসার ওর সাথে। টেলিফোনে হয়তো কোন রকম ভরসা পেয়েছে সে পাসেরোর কাছ থেকে, নইলে এত রাতে একা বাড়ির বাইরে বেরোবার সাহস ফেরেনসির থাকবার কথা নয়।

'সাইমন পাসেরো!' আবার ডাকল প্রফেসার চাপা গলায়।

এইবার উত্তর এল।

'এইদিকে!'

অস্ফুট গলাটা এতই আবছা যে শব্দটা কোন মতে পৌঁছুল রানার কানে। গলাটা চেনা চেনা লাগল না? কার মত? পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু কার? আর একটু জোরে শুনতে পেলে হয়তো বুঝতে পারত, কিন্তু···

কিন্তু রানা তো চেনে না সাইমন পাসেরোকে? জীবনে ওর সাথে দেখা হয়নি। কথাও হয়নি। তাহলে?

তাহলে এর একটাই মানে হতে পারে। যে জবাব দিল, সে সাইমন পাসেরো নয়—গুপ্তঘাতক! এই গোপন সাক্ষাতের কথা কোন ভাবে টের পেয়ে গেছে গুপ্তঘাতক।

পা টিপে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে প্রফেসার ফেরেনসি গুপ্তঘাতকের

কাছে।

'এই যে, এদিকে!' আবার শোনা গেল অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগোল ফেরেনসি ট্যাংকের দিকে।

'কোথাও মস্ত গুবলেট হয়ে গেছে, সাইমন,' বলল ফেরেনসি চলতে চলতে। 'দুই দুইবার অ্যাটেমট নেয়া হয়েছে আমার ওপর। নেহাত কপাল গুণে বেঁচে গেছি। খুব সম্ভব বি.সি.আই-এর কাজ। তোমাদের সাহায্য করতে গিয়ে এখন আমার জান নিয়ে টানাটানি। কই, কিছু বলছ না যে? আমার প্রতি কি কোনই কর্তব্য নেই তোমাদের?'

চিৎকার করে লোকটাকে সাবধান করে দেবে কিনা ভাবল রানা এক সেকেন্ডের জন্যে। দূর করে দিল চিন্তাটা। নিয়তির টানে চলেছে ফেরেনসি। যাক। ঠিক এইভাবেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল লোকটা বাংলাদেশের এগারোজন এজেন্টকে।

ট্যাংকের ছায়ায় পৌঁছেই হোঁচট খেল ফেরেনসি। মনে হলো কেউ যেন বেকায়দা এক ধাক্কা দিল। ধাক্কা খেয়ে আঁতকে উঠল ফেরেনসি, ভয়ার্ত একটুকরো বেসুরো আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। ছিটকে পানির ধারে চলে গেছে সে। ড্রেনের কাছে।

'আপনি!' বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে কথা বলে উঠল প্রফেসার। 'কিন্তু...'

ঠিক এমনি সময়ে একটা ইলেকট্রিক মোটর চালু হওয়ার মৃদু শব্দ কানে গেল রানার। সাথে সাথেই খুলে গেল ট্যাংকের নিচের একটা দরজা। হড় হড় করে ড্রেন বেয়ে নেমে এল বিশ-পঁচিশ মন মাংস, মাছ আর নাড়িভুঁড়ির মণ্ড। আঠালো, রক্তাক্ত।

সোজা নেমে এল ওগুলো প্রফেসারের মাথায়, ঘাড়ে! চিৎকার করবারও সময় পেল না ফেরেনসি। আরও দুই পা পিছিয়ে গেল ওজনের ঠেলায়। দুই হাত শূন্যে তুলে কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল, কিছুই বাধল না হাতে, মাংস, মাছ আর নাড়িভুঁড়ির নিম্নগতির তোড়ে হাঙরের খাবারের সাথে সাথে ঝপাং করে পড়ল সে-ও পানিতে।

মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল তুমুল হুটোপুটি। দেড়ফুট উঁচু ঢেউ উঠে গেল উপসাগরের জলে। খাবার নিয়ে প্রবল কাড়াকাড়ি, মারামারি চলল মিনিট খানেক, তারপর ক্রমে কমে এল আলোড়ন। তারার আবছা আলোয় দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে এল লেগুনের রূপালী পানি। যার যেটা পছন্দ গেলা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

কার ভাগে পড়ল প্রফেসার জর্জিয়ো ফেরেনসি? সে কি জানে, কত বড় একটা জ্ঞানের ভাণ্ডার এখন তার পেটের মধ্যে? হয়তো এখনও মরেনি ফেরেনসি, হয়তো ছটফট করছে হাঙরটার পাকস্থলীতে। হয়তো ওর হাতের রোলেক্স অটোমেটিক ঘড়িটা আগামী কয়েক বছর রয়ে যাবে হাঙরের পেটে, হয়তো চলতেই থাকবে ওটা টিকটিক করে, হয়তো...

*

আসলে চোখের সামনে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে রানা, আবোল-তাবোল অর্থহীন ভাবনা ভেবে চলেছে। সংবিৎ ফিরে পেল সে মৃদু একটা হাসির শব্দে। সাথে সাথেই মনে পড়ে গেল, কাজ পড়ে রয়েছে ওর। এতদিনে পেয়েছে সে গুপ্তঘাতককে। একে চোখের আড়াল করলে চলবে না।

এগোতে গিয়েই হোঁচট খেল রানা।

সরু শক্ত রশিটা ঠিকমত জড়ানো হয়নি। অন্ধকারে লক্ষ করেনি রানা, বেশ কিছুটা রশি পকেটের বাইরে রয়ে গেছে। সেটা পায়ে জড়িয়ে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে সে। সামলে নিতে গিয়ে শব্দ হলো খোয়া বিছানো রাস্তায়।

দুপ্ করে শব্দ হলো ট্যাংকের নিচের অন্ধকার থেকে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। হাত তিনেক দূরে দেয়ালের গায়ে বিঁধল গুলি। ঝপ করে বসে পড়ল রানা। ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার।

কিন্তু গুলি করল না সে। সাইলেন্সার নেই ওর পিস্তলে। এখন গুলি করলে জেগে যাবে সবাই, হৈ-চৈ পড়ে যাবে। গোপনে কাজ সারতে হবে ওকে। কাজেই নিতান্ত বাধ্য না হলে গুলি ছুঁড়বে না সে।

তাছাড়া শত্রুপক্ষের গুলিটা দেয়ালে গিয়ে লাগতেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে গেছে রানা। সাইলেন্সার তো আছেই, তার উপর হাফচার্জ অ্যামিউনিশন ব্যবহার করছে গুপ্তঘাতক আওয়াজ কমাবার জন্যে। গুলির মাযল্ ভেলোসিটি সেকেন্ডে চারশো ফুটের বেশি না। তার মানে কিলিং রেঞ্জ পনেরো ফুটের বেশি না। সুখবর।

সেফটি ক্যাচটা নামিয়ে দিল রানা। ক্লিক করে শব্দ হলো। রানা বুঝল শব্দটা এড়াবে না গুপ্তঘাতকের কান। সত্যিই এড়াল না। পরপর আরও দুটো গুলি করল সে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দেয়ালে লাগল গুলি।

হামাগুড়ি দিয়ে কয়েকহাত এগিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দ পায়ে এগোল ট্যাংকের দিকে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছু—আন্দাজে গুলি করছে গুপ্তঘাতক। গুলি ওর গায়ে লাগার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু আবার বলাও যায় না, হয়তো এর পরের গুলিটা সোজা এসে ওর চোখে ঢুকবে—কে জানে! কিন্তু এ ঝুঁকি নিতেই হবে। অতি সাবধানে বিন্দুমাত্র শব্দ না করে পনেরো গজ পথ অতিক্রম করল রানা পাঁচ মিনিটে। ওই পিলারগুলোর কোন একটার আড়ালে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে গুপ্তঘাতক। কাছে যাওয়াটা ক্রমেই বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। গুলি ছোঁড়া যাবে না, বেশি কাছে যাওয়া যাবে না, তাহলে কিভাবে ঘায়েল করবে সে ওকে?

ট্যাংকের দিক থেকে আরেকটা গুলি হতেই বুঝে গেল রানা লোকটার সঠিক অবস্থান।

গুলি করবে নাকি সে? শুধু একটা?

হোক না আওয়াজ। লোকজন এখানে এসে পৌঁছবার আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে পারবে সে। আর কোন চিহ্ন থাকবে না গুপ্তঘাতকের। রানার

ওয়ালথারটাও যদি ওর সাথে সাথে চলে যায় পানির নিচে তাহলে অতিথিদের একজন বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়ার পরেও রানাকে ফাঁসাতে পারবে না কেউ কোন ভাবে। করবে সে একটা গুলি?

নাহ্। যে কারণে ফেরেনসির প্রত্নতত্ত্ব গুহায় ডক্টর জ্যাকোপোকে হত্যা করতে পারেনি সে, যে কারণে ইয়টে ফেরেনসির মাথা তাক করে প্রকাণ্ড বাক্সটা নেমে আসার পরেও হার্স্টের বুকের ভিতর গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারেনি সে, ঠিক সেই একই কারণে এই মুহূর্তে গুলি করতে পারল না রানা। খটকা রয়েছে ওর মনে। কিছুতেই নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

কাজেই কাছে এগোনোই স্থির করল সে। পা বাড়াতেই ছোট্ট একটা কাঁকরে চাপ লেগে কড়মড় শব্দ হলো একটু। সাথে সাথেই আরও দুটো গুলি ছুটে গিয়ে লাগল দেয়ালে। একটা গেল একেবারে রানার কান ঘেঁষে। রানার অবস্থানটাও মোটামুটি বুঝে গেছে গুপ্তঘাতক।

আরও কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। এক্ষুণি আর সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। আর অন্তত একটা গুলি আছে লোকটার পিস্তলে, এত কাছে থেকে ওটা মারাত্মক হতে পারে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে, কিন্তু নড়ে না রানা। গুপ্তঘাতকের স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করছে সে। দেখা যাক কতক্ষণ অপেক্ষা করে লোকটা। ভোর পর্যন্ত এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না নিশ্চয়ই? এক ঘণ্টার মধ্যেই এগিয়ে আসতে হবে ওকে শেষের গুলি দুটোর ফলে রানা মারা গেছে কিনা দেখতে। কাজেই অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই রানার।

বিশ মিনিট পার হয়ে গেল। দুই পক্ষই চুপ। অথচ দুজনেই জানে আট হাতের মধ্যে আছে ওরা পরস্পরের। সময় আর কাটতে চায় না কিছুতেই।

ট্যাংকের কাছে মৃদু শব্দে কান খাড়া করল রানা। ঠিক কিসের শব্দ বুঝতে পারল না সে। পালাচ্ছে? না সামনে আসছে? একটু ঝুঁকে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়াল ও।

আবার এল শব্দটা। ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। কিসের শব্দ? হাঙর-খাবারের ট্যাংকের কাছ থেকে আসছে শব্দটা, খসড়...খসড়...কি করছে ব্যাটা? থেমে গেল শব্দটা।

এবার মৃদু ঝনঝন শব্দ হলো। কেরোসিনের খালি টিনের গায়ে লাথি দিলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেই রকম। আবার হলো শব্দটা।

হঠাৎ বুঝে ফেলল রানা ব্যাপারটা। পিলার বেয়ে উঠে গেছে! এতক্ষণ কেন টের পায়নি সেজন্যে নিজেকে ছোট্ট একটা গালি দিয়ে দৌড় দিল সে ট্যাংকের পিলারগুলোর দিকে পায়ের আওয়াজ গোপন করবার কোন রকম চেষ্টা না করেই।

ছায়া-মূর্তি দেখতে পেল রানা। পিছনে আকাশ থাকায় পরিষ্কার দেখতে পেল, ফিশ-ফুড-ট্যাংকের উপর থেকে লাফিয়ে দেয়ালের মাথায় নামল গুপ্তঘাতক।

পিলার বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা।

ধুপ করে শব্দ হলো দেয়ালের ওপাশে। ষোলো ফুট উঁচু দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে গেল গুপ্তঘাতক। আর কেউ হলে পা মচকে বা ভেঙে পড়ে থাকত ওখানেই, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেল রানা, দৌড়ে চলে যাচ্ছে লোকটা কার-পার্কের দিকে।

ঠিক বিশ সেকেন্ড পর ধুপ করে ওপারে নামল রানাও।

খক্ করে একটা সেলফ-স্টার্টারে কাশির আওয়াজ এল। ইঞ্জিনের গুঞ্জন ভেসে এল। গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে।

দাঁতে দাঁত চেপে হান্ডরেড মিটার স্প্রিন্ট দিল রানা। ও যখন কার পার্কে পৌঁছল তখন বাতি নিভানো অবস্থায় মসৃণ গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা ক্যাডিলাক খোলা গেট দিয়ে।

একলাফে একটা রোলস সিলভার ক্লাউড থ্রী-র ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। ইগনিশন কী ঘুরাতেই ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। রওনা হওয়ার পূর্বমুহূর্তে থমকে থেমে ভাবল রানা : ক্যাডিলাকটা নিয়ে রওনা হওয়ার আগে ইচ্ছে করলেই বাকি চারটে গাড়ির ইগনিশন কী খুলে নিতে পারত গুপ্তঘাতক, বড়জোর দশ সেকেন্ড সময় ব্যয় হত তাতে, ওকে অনুসরণ করতে বেশি কিছুক্ষণ দেরি হয়ে যেত রানার—কিন্তু তা না করে অনুসরণের সুযোগ রেখে গেল কেন লোকটা? আতঙ্কে দিশে হারিয়ে ফেলেছে? প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে?

গুইসেপ ভিলার খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে মৃদু একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। বাতি জ্বেলে দিয়েছে সামনের গাড়িটা। দূরে দেখা যাচ্ছে লাল ব্যাক লাইট। ভালই হলো, পিস্তল ব্যবহারে কোন বাধা রইল না আর।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর আর একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল গুইসেপ ভিলা থেকে বাতি না জ্বেলে।

সাগরের ধার ঘেঁষে কয়েক মাইল দক্ষিণে এসে হঠাৎ ডানদিকে মোড় নিয়ে পশ্চিমে ছুটল ক্যাডিলাক। বিপজ্জনক গতিতে ছুটছে ওটা। লিংগুয়াগ্লোসা ছাড়িয় ছুটে চলল আরও পশ্চিমে। ক্রমে সাগর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আর উঁচুতে উঠছে। এক ঘন্টা একনাগাড়ে ছুটবার পর নিচু এলাকার ফসলের মাঠ এখন আর চোখে পড়ছে না, উঠে এসেছে ওরা পাইন, বীচ, ফার্ন আর বাদামের জঙ্গল এলাকায়। রাস্তাটাও অনেক সরু হয়ে এসেছে এখানে।

রানা আশা করেছিল জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করবে ক্যাডিলাকের আরোহী, কিন্তু থামল না সেটা। হয় তীব্র আতঙ্ক, নয়তো বেপরোয়া আনন্দে পাগলের মত গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা। জঙ্গল ছেড়ে আরও উঁচুতে উঠে গেল ওরা। ক্রমে উঠে যাচ্ছে মাউন্ট এটনা আগ্নেয়গিরির চূড়ার দিকে।

উপযুক্ত জায়গাতেই নিয়ে চলেছে ওকে গুপ্তঘাতক—ভাবল রানা। মাউন্ট এটনা—মানে, আগুনের পর্বত। গ্রীক উপকথার বিশ্বাসঘাতক দৈত্য টাইফনকে হত্যা করেছিল জিউস এই পাহাড়েই।

গাড়িতে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে তারপর গাড়ি ছেড়ে দৌড়াতে শুরু

করল গুপ্তঘাতক। রানাও ছুটছে পিছু পিছু। ভোর হয়ে আসছে, সেই আলোয় মনে হচ্ছে অন্য কোন গ্রহের পাহাড়ে উঠছে সে। শত শত বছর আগের অগ্নি-উদগিরণে আজব সব বিকট আকৃতির পাথর তৈরি হয়েছে গলিত লাভা দিয়ে। হঠাৎ মনে হয় দুঃস্বপ্নে দেখা রাক্ষস বুঝি।

সামনে থপ থপ পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে গুপ্তঘাতক। এখন আর ছুটছে না ওরা। কোনরকমে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে সামনে।

আগ্নেয়গিরির মুখের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে রানা প্রচণ্ড গরমে। সালফারের দুর্গন্ধে দম আটকে আসবার উপক্রম হয়েছে। একগুঁয়ে ভঙ্গিতে উপরে উঠে যাচ্ছে লোকটা।

আবছা আঁধারে বার দুই পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে পেল রানা ওকে, কিন্তু গুলি করল না। এত অস্থিরতার কিছুই নেই, এখুনি শেষ মোকাবিলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবে গুপ্তঘাতক—জানে সে।

সত্যিই, একটা বড় পাথরের আড়ালে পড়েছিল গুপ্তঘাতক, পাথরটা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা।

পুব আকাশে হালকা একটা লাল আভা দ্রুত বাড়ছে। ভোর হয়ে এসেছে। পনেরো গজ দূরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে গুপ্তঘাতক। রানা থমকে দাঁড়াতেই ঘুরল রানার দিকে।

'আমার পেছনে কেন লেগেছ, মাসুদ রানা?' মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের উপর থেকে অবাধ্য চুল সরাল লরেলী হার্স্ট।

স্থির, নিষ্কম্প হাতে পিস্তলটা ওর বুকের দিকে ধরে মৃদু হাসল রানা। 'তোমাকে হত্যা করার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে। বাংলাদেশ থেকে।'

'তাই নাকি?' উচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত, বেপরোয়া হাসি হাসল লরেলী। 'কিন্তু আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে না তোমরা?'

'না। হেড অফিস থেকে আমাকে বলে দেয়া হয়েছিল, গুপ্তঘাতক হয় তোমার বাবা, নয় ডক্টর জ্যাকোপো।'

'তবু অবাক হচ্ছ না যে? আমাকে কখন চিনতে পেরেছ তুমি?'

'এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি একটু পরে। তার আগে বলো দেখি, তুমি এ পথে স্বেচ্ছায় এসেছ না ড্রাগসের পাল্লায় পড়ে আসতে বাধ্য হয়েছ?'

লরেলীর হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। উত্তর দেয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিল সে।

'জানোই যখন, তোমাকে বললে কোন ক্ষতি নেই। শখ করে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম হেরোইন, এখন সেই হেরোইনই ব্যবহার করছে আমাকে। ঠিকই বলেছ, স্বেচ্ছায় আসিনি এ পথে।' কথাটা বলেই চট করে যোগ করল, 'তবে সুপথে ফিরে যাওয়ারও কোন ইচ্ছে আমার নেই। ড্রাগস ছাড়া বাঁচব না আমি। মাফিয়ার সাহায্য ছাড়া হেরোইন পাব না কিছুতেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সাধারণ কেউ হলে কোনই অসুবিধে ছিল না, কিন্তু কোটিপতি হেনরী হার্স্টের মেয়ের পক্ষে ড্রাগস সংগ্রহ করা সত্যিই কঠিন। নেশাটা হলো কিভাবে?'

'স্কুলে থাকতে। বয় ফ্রেন্ডের দৌলতে।'

'ফেরেনসির গুহার কাছে মাফিয়ার হাতে বন্দী হওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অভিনয়। রাটল্যান্ডের রিভলভার থেকে গুলি বের করে নিয়ে খালি খোল পুরে দিয়েছিলে তুমি। কেন?'

'এক ঢিলে কয়েক পাখি মারতে চেয়েছিল সাইমন পাসেরো। হঠাৎ করে কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ায় ড্যাডের গাঁট থেকে কিছু খসিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমার সাথে মাফিয়ার যোগাযোগ রয়েছে সেটা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল হ্যারি রাটল্যান্ড, তাই ওর মুখ বন্ধ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফেরেনসির গুহার বিস্ফোরণের ব্যাপারে যেন আমার ওপর কারও সন্দেহ না পড়ে সেজন্যেও এর দরকার ছিল। তাছাড়া ওই নাটকটা মঞ্চস্থ করবার ফলেই তোমার পরিচয় পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল সাইমনের কাছে। যে তেলেসমাতি কাণ্ড দেখালে তাতে বোঝা গেল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এবার তার সেরা এজেন্ট পাঠিয়েছে ইজিপ্শিয়ান ক্যামেরাম্যানের ছদ্মবেশে।'

'বুঝলাম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর মাফিয়ার সেই যুবকটাকে খুন করলে কেন তুমি?'

'সব কথা বেরিয়ে পড়ত ও তোমাদের হাতে ধরা পড়লে—এটা হলো প্রথম কারণ। কিন্তু প্রধান কারণ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার ওপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করছিল লোকটা। তোমরা পৌঁছে আমাদের যে অবস্থায় দেখেছিলে ওটুকু অভিনয় ছিল না। ভয়ানক খেপে গিয়েছিলাম আমি।' মধুর হাসি হাসল লরেলী রানার দিকে চেয়ে। 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?'

'হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। যে আশ্চর্য কৌশলে আমাদের এগারোজন এজেন্টকে হত্যা করেছ সেসব কার মাথা থেকে বেরিয়েছে? তোমার, না, পাসেরোর?'

'আমি কি করে জানব ওসব কৌশল? আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু মেয়ে বলে। শুধু মেয়ে ঠিক নয়, কোটিপতি হেনরী হার্স্টের মেয়ে। ঘটনাস্থলে আমার উপস্থিতি কারও সন্দেহ জাগাবে না— তাই। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে এসব জটিল যন্ত্রপাতি আমার দ্বারা ব্যবহার করা সম্ভব। অথচ আমিই করেছি সব, সাইমনের নির্দেশ মত টিপে গেছি কলকজা, যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে। ক্রেডিট যদি থাকে তাহলে সেটা আমার নয়, সাইমন পাসেরোর প্রাপ্য।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। ভাবছে সে। ওকে চুপ দেখে আবার কথা বলে উঠল লরেলী।

'তোমার প্রশ্ন শেষ হয়ে থাকলে এবার আমার দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'নিশ্চয়ই!' হাসল রানা। 'কি জানতে চাও?'

'আমাকে কখন সন্দেহ করলে তুমি?'

'প্রথম দিনই। কিন্তু কাল রাতে যখন আমার ঘরে এলে তখন তোমার

হাতে ইঞ্জেকশনের দাগ দেখে আঁচ করে নিলাম অনেক কিছুই।'

'কখন নিশ্চিত হলে আমিই গুপ্তঘাতক? ফেরেনসিকে লেগুনের মধ্যে ফেলে দেয়ার পর?'

'নিশ্চিত আমি এখনও হতে পারিনি, লরেলী। তোমাকে গুপ্তঘাতক বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে দ্বিধা আছে আমার মনে। নিশ্চিত হতে পারলে এতক্ষণ গল্প করে সময় নষ্ট করতাম না, দুটো গুলি জায়গা মত ঢুকিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে যেতাম বাড়ির দিকে।'

'তোমাকে গুইসেপ ভিলা থেকে এতদূরে, মাউন্ট এটনায় নিয়ে এসেছি কেন তা জানো?'

'জানি। আমার লাশটা ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে তোমরা দু'জন ফিরে যাবে বলে।'

'দু'জন!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল লরেলীর দুই চোখ। 'দু'জন মানে? তুমি জানো যে আমি একা নই? তুমি জানো যে…'

'আমি অনেক কিছুই জানি, লরেলী। আমি জানি, ক্যাডিলাকে সাইমন পাসেরোও ছিল তোমার সঙ্গে। আমি তোমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি, আর আমাকে অনুসরণ করে এসেছে ও। কোন একটা নাটকীয় মুহূর্তে আমাকে চমকে দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবে বলে কয়েক গজ পিছনে একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছে।'

লরেলীর চোখের দিকে চেয়ে ছিল রানা। ঠিক সময়টা বুঝে নিল ওর চোখের দিকে চেয়েই। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে। পড়েই এক গড়ান দিল। কড়াৎ করে গর্জে উঠল একটা কোল্ট ফরটি-ফাইভ। রানার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। আরও একটা গুলি এল ওপাশ থেকে, রানার মাথার উপর একটা পাথরে লেগে বাঁকা হয়ে চলে গেল গুলিটা লরেলীর দিকে। গড়াতে থাকা অবস্থাতেই গুলি করল রানা। সাইমন পাসেরোর তৃতীয় গুলিটা রকেটের মত ছুটল আকাশের দিকে। উঠে বসে দেখল রানা, ধোপ-দুরস্ত স্যুট পরা সুদর্শন এক যুবক এগিয়ে এল দুই পা টলতে টলতে বাম হাতে বুক চেপে ধরে, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। গুপ্তহত্যার আসল নায়ক।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে আগের কথার খেই ধরল রানা।

'আর এ-ও জানি, শুধু আমিই নই, আমার পিছু পিছু আরও একটা গাড়িতে আরও দু'জন এসেছে আজ এখানে।' গলার স্বর উঁচু করে ডাকল রানা, 'মিস্টার হার্স্ট, ডক্টর জ্যাকোপো! লুকিয়ে থেকে লাভ নেই বেরিয়ে আসুন।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'তোমার বাবা যদি আমার প্রাণ…' লরেলীর দিকে ফিরেই থেমে গেল রানা।

মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ছটফট করছে লরেলী হার্স্ট। এগোতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় হেনরী হার্স্টের বাজখাঁই কণ্ঠস্বর ককিয়ে উঠল।

'প্লীজ, মাসুদ রানা! গুলি কোরো না। আমার চোখের সামনে মেরো না আমার বাচ্চাকে। যদি মারতে হয়, আমি মারব। নিজ হাতে।'

'দাঁড়ান!' কঠোর সুরে আদেশ দিল রানা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেনরী

হার্স্ট। ডাক্তারের দিকে চাইল রানা। 'ডক্টর জ্যাকোপো, জখমটা পরীক্ষা করে দেখুন।'

এগিয়ে এল ডাক্তার। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে বলল, 'বাম উরুতে ঢুকেছে গুলিটা। খুব সম্ভব মারাত্মক কিছু নয়।'

পিস্তলটা হোলস্টারে পুরে রেখে নামতে শুরু করল রানা। হার্স্টের সামনে এসে থামল।

'চিকিৎসা করালেই সেরে যাবে। ড্রাগ হ্যাবিটও দূর হয়ে যাবে উপযুক্ত চিকিৎসায়। নিজের কানেই শুনেছেন সব। কাজেই বলবার আর কিছুই নেই আমার।' রওনা হতে গিয়েও থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওর শুধরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই ছেড়ে দিলাম—দয়া বা মায়া করে নয়।'

নেমে চলে গেল রানা। হার্স্টের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল।